মণি বউদি

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

সম্মানভাজনেষু

এক

পরিণত বয়সে জীবনের শেষাঙ্কে এসে বিচিত্র-চরিত্রের পালা ধরে অতীত-সমুদ্র মন্থনে যে আনন্দ পেয়েছি তা কল্পনা করিনি। আমার পাঠকেরাও সাড়া দিয়েছেন। প্রথম চরিত্র ক্ষ্যাপা বাউল থেকেই সাড়া পাচ্ছি। হঠাৎ এক পাঠিকা অনুযোগ করলেন—বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে নারীচরিত্র নেই কেন? প্রশ্নটা তাঁর ঠিক হয় নি, কারণ নারীচরিত্র ছিল বই কি! পার্শ্বচরিত্র হিসেবে পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে নারীচরিত্র এসেছে। সে চরিত্র পুরুষ চরিত্র থেকে কম বর্ণাঢ্য নয়। আবার মূল চরিত্র হিসেবেও নারীচরিত্র তার আগে এসেছে। মানে পত্র-লেখিকার পত্র আসবার আগেই এসেছে। তার মধ্যে 'কালবউ' সম্পর্কে বেশ সাড়া পেয়েছিলাম। তবুও পত্রলেখিকার পত্র পেয়ে অবধি বিচিত্র নারীচরিত্রের কথাই লিখে চলেছি। শুরু করেছিলাম 'মলিকে' নিয়ে। মলির পর কৃষ্ণা। বলা বাহুল্য তারা আমার অন্তর বৃন্দাবনের কল্পযমুনা তটবর্তী কুঞ্জবন-বাসিনী। ভেবেছিলাম হয়তো বা এর পর তিরস্কার-মধুর পত্র পাব। কিম্বা মিষ্ট সম্ভাষণ ভরা একছত্রের পত্র। হয়তো লিখবে—বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে—এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে? অথবা লিখবে—"বহুদিন পরে—"। কিন্তু না, তা পাই নি। হয়তো তাদের কাছে লেখা পৌঁছোয় নি। অথবা তারা তিক্ত বিরক্তির সঙ্গে কাগজের সংখ্যাটা বন্ধ করেছে।

তা তারা করুক। তারা পত্র না লিখুক, অন্যে অনেকে এই নারীচরিত্রের বৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পত্র লিখেছে আমাকে। নতুন নারীচরিত্রের কাঠামো বা রেখাচিত্র বা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ করেছে, এবার আপনার তুলি ও রঙে এদের ছবি সম্পূর্ণ করে করে তুলে ধরুন। 'ক্লীন মুন' নির্মলচন্দ্র লিখেছে টুনুবিবি বা কাজলরেখার কথা। সুরঞ্জন জানিয়েছে বিচিত্র মা—কাত্যায়নীর কথা।*

আরও অনেক পত্র পেয়েছি। মেয়েদের লেখা চিঠিও আছে এর মধ্যে। কেউ লিখেছেন —"আমার কথা লিখুন। আমি অকপটেই আপনাকে আমার জীবনের কথা লিখছি। এর মধ্যে একটিও বানানো কথা নেই জানবেন। তবে আমার নাম ঠিকানা সত্য নয় একথা অকপটে কবুল করেই তার জন্যে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

বানানো গল্প আছে। একটা গল্পের মধ্যে পরিচিত চরিত্রের আভাস পেয়েছি। তবে মনে হয়েছে অতিরঞ্জনে বিকৃত করে অন্য কেউ চরিত্রটিকে নিজের নামে চালাতে চেয়েছে। সে সব পত্রের দুচারখানি যে বৈচিত্র্যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার উপর ঠিক আস্থা স্থাপন করতে পারি নি এবং মনও যেন আকৃষ্ট হয় নি। সাহিত্যে ঘটাতে পারলে সবই ঘটে : যেমন মহাভারতে সাবিত্রী যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছে অথবা রাবণের দশ মুণ্ড যতবার কেটেছে ততবার গজিয়েছে। এবং ভূতেরা চিরকাল গল্পের মধ্যেই বসবাস করে—গাছে বা বাড়ীতে থাকে না এ জেনেও গল্প বলার গুণে ভাঙা পড়ো বাড়ীতে বা ঝাঁকড়া গাছের

* লেখকের 'নারীরহস্যময়ী' দ্রষ্টব্য

তলায় আমরা ভূতের ভয়ে শিউরে উঠি। সুতরাং বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্বের লোভে ওসব থেকে চরিত্র নেব না। যে গল্পের লক্ষ্য কেবলমাত্র জীবন-সত্যের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করবার জন্য বা কতকগুলো স্বাস্থ্যহীন দেহধারীর অসুস্থ মনের অশ্লীল আকাঙ্ক্ষা পূরণের পল্‌তেকে উস্কে দেবার জন্য, তা নিয়ে ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে আমার ইচ্ছে নেই।

সংসারে এককালে মেয়েরা পণ্যবস্তুর মত বিক্রী হয়েছে। এমন কি সুপবিত্র ধর্মশাস্ত্র থেকে মন্ত্র পাঠ ও শপথ করে ঈশ্বর সাক্ষী রেখে বিয়ে হওয়া মেয়েদের বন্ধন-যাতনা বা জীবনদুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়া যায় নি একথা কঠোর সত্য। এখানে শাস্ত্র ঈশ্বর দুই সাক্ষীকেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার দায়ে অনায়াসে অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু এ-কালে—যে-কালে আইন-বলে মেয়েরা মুক্তি পেয়েছে—যে-কালে সমাজ ভেঙেছে মানুষের বোধের বলে, সে-কালে পেটের দায়ে বা সুখ-সংস্থানের সঙ্গতি অর্জনের জন্য মেয়েরা যেখানে দেহ নিয়ে কারবার করার খাতে নিজেদের জীবনস্রোতকে বইয়ে দেয়, সেখানে ওই প্রবাহিনীকে নদীও বলব না ঝরনাও বলব না, বলব কলঙ্কিনীর খাল। স্নান পান দূরের কথা, ও জলে পা ডোবালেও আবার পা ধুতে হয়। কিন্তু যে মেয়েরা জীবনে দেহের বা মনের তাগিদে সব বাধাবন্ধ বা বেড়াকে উপেক্ষা করে বা ভেঙে বা ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়ে পুরুষের হাত ধরে, তাদের আমি সেকালের স্বয়ম্বরার মত সম্ভ্রম করি।

পুরুষদের বেলাতেও তাই। যে পুরুষেরা সবল, বীর্যবান তারা নারীকে অর্থমূল্যে কিনতে চায় না। তারা নারীচিত্তকে জয় করে স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের মত, এবং দেশ থেকে দেশান্তরে এক বাসর থেকে আর এক বাসরে বাসি মালার বদলে নতুন মালা গলায় প্রবেশ করে। তাদেরও আমি নিন্দা করি না। একালে তো ব্যাপারটা আরও সরল হয়ে এসেছে। বিবাহের চেয়ে বড় নতুন-সম্পর্ক-ক্ষেত্রের দোর খুলে গিয়েছে। কিন্তু যে-দুর্বল ভীরুরা হ্যাংলামি বা চোরামি করে নারীমহলে ভিক্ষুকের মত বা গাঁটকাটার মত কারবার চালাতে চায় অথবা কয়েকটা রজত মুদ্রা পকেটে নিয়ে দেহ কিনতে আসে তাদের আমি চরিত্রের আসরে একান্ত-ভাবে ব্রাত্য বলে মনে করি। চরিত্র বলতে আমি আচার বিনয় বিদ্যা সংযম প্রভৃতি গুণ-সম্পন্নতার কথা বলছি না, বলছি, যে প্রকৃতি-ধর্ম মানুষের কাছে মানুষকে একটি পরিচ্ছন্ন বা বলিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত করিয়ে দেয়, তাই।

থাক।

অনেকখানি ঠাঁই এতেই চলে গেল। হয় তো শিল্পবিচারে ঐ আলোচনা নিয়ে এতখানি স্থান অপব্যয় করা উচিত হল না। শাড়ীখানার জমি ও পাড়ের অনুপাতে আঁচলখানা বড় হয়ে গেল।

আমি চিঠির গাদা সরিয়ে দিয়ে এবার বলব মণি বউদির কথা। চিঠিগুলো নিয়ে যখন ভাবছিলাম এর মধ্যে কোনখানিকে বেছে নেওয়া যায়—তখনই একখানা চিঠি এল—যে চিঠিখানা বহন করে নিয়ে এল মণি বউদিদির মৃত্যুসংবাদ। সংবাদ দেবার জন্য দেওয়া হয় নি; শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে আমার নামে, যে-হেতু মণি বউদির পরিত্যক্ত

সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা হয়েছে যে দলিলে, সেই-দলিলের আমি একজন সাক্ষী। পিণ্ডিং দত্তা ধনং হরেৎ—এ বিধানটা আজও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কালো কালিতে মোটা হরফে ওঁ গঙ্গা লেখা চিঠিখানা হাতে করে বাকি চিঠিপত্রগুলোর কথা সব ভুলে গেলাম। মণিবউদিকে আজও কেন মনে পড়েনি এর জন্য নিজেকে তিরস্কার করতেও অবকাশ পেলাম না। মনের স্মৃতির ঘরের দরজা খুলে মণিবউদি হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বললেন—জানি গো জানি, তুমি আমায় ভোল নি, ভুলতে পার না—একথা আমি জানি এবং মানি। আবার মনে মনে আন্তরিকভাবে মানি—তাই জানি, সকলের থেকে বেশী করে জানি এবং সত্য বলে জানি।

সঙ্গে সঙ্গে গালে টোল-ফেলা, সেই মুখ টিপে হাসি।

মণিবউদি সম্পর্কে আমার বউদিই হতেন কিন্তু দিদিও বলেছি অনেক সময়।

মণিবউদি আমার থেকে সম্পর্কে বড় কিন্তু বয়সে ছোট। বেশ কিছু বছরের ছোট; আমার গৃহিণী আমার থেকে ছ' বছরেরও কিছু বেশী, মানে ছ' বছর ক' মাসের ছোট; মণি বউদি আমার গৃহিণী থেকেও আবার আট দশ বছরের ছোট। এবং আমাদের সম্পর্কটা ফেল্‌না সম্পর্ক নয়।

সম্পর্কের স্বরূপটা ঠিক প্রকাশ করব না, কারণ মণিবউদির পরিচয়ের যে বিচিত্র রূপ আমি দেখেছি, সে-রূপ প্রকাশ করবার পর আমার এবং মণিবউদির আপনজনদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে অন্তরে আমার অ-সুখ অস্বস্তির আর শেষ থাকবে না। তাছাড়াও কথা আছে; সেটা হল—মণিবউদিকে আপন বলে স্বীকার করা বা দাবী করা সংসারে বা সমাজে সহজ কথা নয়। আমাকে নিজেকেই কি এই বউদিটিকে আমার আত্মীয় আপনজন বলে মেনে নিতে, স্বীকার করতে, কম বেগ পেতে হয়েছে? প্রায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি বলতে গেলে।

পরিচয়ের প্রথম যুগটা তাঁকে স্বীকার করি নি। একেবারে একটা যুগ অর্থাৎ পুরো বারো বছর। প্রথম মণিবউদির সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশুনো এবং পরিচয় হয়েছিল ১৯৪২ সালে।

তখন কিছু কাল হল সবে কলকাতায় বাসা করেছি। আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে থাকি। জীবনে প্রতিষ্ঠা আসছে। 'কালিন্দী' নাটক নাট্যনিকেতনে হয়েছে বটে কিন্তু মধ্যপথে থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে স্টেজের মালিকের মামলার ফলে মালিককে থিয়েটার বন্ধ করতে হয়েছে। এর পর এই দিকের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হল 'দুই পুরুষ' নাটকের সাফল্যে।

সেকালে—; সেকালই বা বলি কেন—এ কালেও বটে, সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠার বিচার গল্প উপন্যাস বা কবিতার রসোত্তীর্ণতা নিয়ে ঠিক নয়, ও নিয়ে বিচার যাঁরা করেন তাঁরা জাত হংস; নীরের মধ্য থেকে ক্ষীর গ্রহণের ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা। সাধারণ লোকের কাছে সাহিত্যিকের সাফল্যের বিচার নির্ভর করে তার কখানা বইয়ের ক'টা সংস্করণ হল এবং কখানা বই ছবি হল বা কখানা নাটক স্টেজে হল, এই তথ্যটির উপর। সাধারণের মধ্যেও আবার অসাধারণ আছেন, যাঁরা হচ্ছেন নাকি, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিত, গাড়ী,

বাড়ী ও বিষয়সম্পত্তি ও ব্যবসায়-ব্যণিজ্য-ক্ষেত্রের মহাজন।

এমনি একজন মহাজনদাদার নাম—ধরুন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। যাঁর নাম অনেক শুনেছি কিন্তু কখনও দেখি নি। গাড়ী বাড়ী বিষয় ব্যবসায়ের মালিকানি ছাড়াও এঁর মহাজনত্বের মধ্যে আরও বিশেষত্ব ছিল এই যে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যে সব বি-এ, এম-এ পাশ ব্যক্তি দেশে দেশহিতৈষী বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, অবিবাহিত থেকে ব্রতচারণার মত দেশসেবা কর্ম করে চলতেন, ইনি তাঁদেরই একজন। এবং সে-কালে আচার্য রায়ের মন্ত্রশিষ্য বলে নিজেকে দাবী করতেন। অমৃতবাবু—আমার অমৃতদা'র ইচ্ছে ছিল না যে, তিনি ধনী মানুষ হন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাঁকে ধনী মানুষ করে দিলে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে দশজনের দোরে ধরণা দিয়ে শেয়ার বিক্রী করে একটা কাপড়ের কল এবং কাপাসের চাষ করবার কল্পনা নিয়েছিলেন। এবং তারই প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে একটা বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর কিনেছিলেন কোন স্থানে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ১৯২১-এর অনেক আগে, শেষ হল ১৯২১-এর কিছুদিন পর। কোম্পানী ফেল পড়ল, অমৃতদা ইনসলভেন্ট হলেন; পতিত প্রান্তরটা থেকে গেল অমৃতদা'র মার নামে। ১৯২৫।২৬ নাগাদ সেই বন্ধ্যা প্রান্তরটা প্রসব করলে একজাতীয় বিচিত্র পাথুরে মাটি। যে-মাটির নাম হল ফায়ার-ক্লে। আগুনে লোহা গলে জলের মত যখন তরল হয় তাকে তখন ধারণ করতে পারে কেবল এই ফায়ার-ক্লে মাটি। লোহার যে পাত্রে লোহা গলানো হয়, সেই পাত্রের ভিতরটায় এই মাটি এবং এই মাটিতে তৈরী ইট দিয়ে আর একটা আবরণ তৈরী করে নিতে হয়, তবে লোহা গলানো সম্ভবপর হয়। নইলে লোহার পিণ্ডের সঙ্গে লোহার পাত্রটারও গলে যাবার কথা। এ মাটি লোহার যুগের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মাটি।

অমৃতদা এই মাটি মূলধন করে কারখানা গড়বার জন্য নতুন কোম্পানী খুললেন। এবং সোনা মাটি মাটি সোনা এই সত্যটাকে পরমহংসদেবের আর নিঃসন্দেহে আর একবার প্রমাণিত করলেন। অবশ্য পরমহংসদেবের সত্যের উল্টোপিঠটাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করলেন। কথাটা আমার নয়, কথাটা অমৃতদা'র। দশ বিশটা কথার মধ্যে একবার না একবার তিনি বলতেনই কথাটা। বলতেন—দেখ হে, সত্য যা তার এ পিঠও যেমন সত্য ও পিঠও ঠিক তেমনি সত্য। সত্যের উল্টো বলে সেটা মিথ্যে নয়।

আরও গম্ভীর হয়ে বলতেন—দেহেরই ছায়া পড়ে। আত্মার ছায়া পড়ে না। সে ট্রানসপেরেন্ট।

ইনি সে কালের অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট মহলের এ. মুকুরজী বা মুকুর-জী-সাব; এবং দেশসেবকদের কাছে খদ্দরপরা মহান ব্যক্তি, তার সঙ্গে দার্শনিক; পণ্ডিত তো বটেনই। তাঁর চিঠির কাগজ থেকে দরজার পাশের নেমপ্লেটে তাঁর নামের শেষে লেখা থাকে দুটি ইংরিজী অক্ষর M. A.। ইনিই আমার অমৃতদা। উত্তর কলকাতাতেই সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু থেকে বের হওয়া একটি প্রশস্ত রাস্তার উপর বাড়ী করেছেন। হঠাৎ তাঁর পত্র পেলাম একটা। এম্‌বসিং পদ্ধতিতে অমৃতভাণ্ড লাঞ্ছিত একখানি মূল্যবান চিঠির কাগজে

স্বহস্তে লিখেছিলেন চিঠিখানা। চমৎকার ইংরিজী ভাষায় লেখা। চিঠিখানা হারিয়ে গেছে। মর্মার্থ মনে পড়ছে। সম্বোধন ছিল, মাইডিয়ার···বাবু। অতঃপর মর্মার্থ বাংলায় লিখছি। ভাষাটা আমারই হয়ে গেল।

"তুমি (বা আপনি) আমার পত্র পেয়ে আশ্চর্য হবে নিশ্চয়। তবে আমি নিশ্চিত যে তোমার সঙ্গে আমার নিকট আত্মীয়তার বিষয় সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ নও। তিনপুরুষ পূর্বে যাটটি বিবাহ দ্বারা বিখ্যাত, যাটটি পত্নীর স্বামী, যেটেরা কালিচরণ তোমার শ্বশুরের ঠাকুর্দা একথা নিশ্চয় জান। এই যেটেরা কালিচরণেরই আর এক পৌত্র আমার পিতৃদেব। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর পিতামহ এবং আমার পিতামহ বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ দুই মায়ের সন্তান হইলেও এক পিতার সন্তান। ফলতঃ তোমার স্ত্রী আমার খুড়তুতো বোন। সুতরাং আমি তোমার ব্রাদার-ইন-ল। বয়সে অবশ্য অনেক তফাৎ হইবে। অত্যন্ত আফসোসের কথা—ম্যাটার অব গ্রেট রিগ্রেট যে, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। তুমি এখন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। নাট্যভারতীতে তোমার দুই পুরুষ নাটক দেখিতে গিয়া অমরের সঙ্গে দেখা হইল। সে-ই বলিয়া দিল যে, তুমি চারু-খুড়োমশায়ের জামাতা। আমার ভগ্নীপতি। নাটকটি খাসা লাগিল। বেড়ে লিখিয়াছ। কঙ্কনার বাবুদের নাম করিয়া···দের খুব ঠুকিয়াছ। যাহাই হউক তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চাই। এ বিষয়ে আমার গৃহিণীর খুবই উৎসাহ। আগামী রবিবার আমাদের বাড়ীতে একটি মজলিস হইবে। তুমি সস্ত্রীক অবশ্যই আসিবে। অবশ্যই আসিবে। কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকিবেন। আলাপে উপকৃত হইবে বলিয়া মনে করি। নিশ্চয় আসিবে। রবিবার বৈকাল পাঁচটার সময় গাড়ী পাঠাইব।"

আমি অমৃতবাবুর নাম যে আত্মীয় হিসেবে শুনিনি তা নয়; তবে আমার শ্বশুরদের সঙ্গে ওঁর মেলামেশার আত্মীয়তা ছিল না। অমৃতবাবু এম-এ পাশ এবং এককালে দেশসেবক ছিলেন বলে শুধু-মাত্র ব্যবসায়ী, খনির মালিক আমার শ্বশুরদের সঙ্গে বেশ একটা অন্তরের মিল ছিল না। একটা কমপ্লেক্স কাজ করত উভয়পক্ষে। আমার খোদ শ্বশুরেরা খনি ব্যবসায়ে অমৃতবাবু থেকে বৃহত্তর ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এম-এ পাশ এবং এককালে দেশসেবক হিসেবে অমৃতবাবু এঁদের থেকে অনেক উচ্চনাসা ব্যক্তি ছিলেন, এবং এঁদের বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে মহত্তর সত্তা বলে জাহির করতেন।

মণি বউদির কথা বলতে গিয়ে অমৃতদার কথা বেশী বলতে হল। না-বলে উপায়ও নেই। ছায়া, সে যেমনই হোক, যে কায়ার সে প্রতিফলন, তাকে বাদ দিয়ে তো তার কোন অস্তিত্বই নেই। বিশেষ করে অমৃতদা এবং মণি বউদির ক্ষেত্রে এই সত্যটা অত্যন্ত কঠিন বাস্তবের রূঢ়তায় রূপ নিয়েছে। সে-কথা পরে প্রকাশ পাবে।

আমি একাই গিয়েছিলাম, আমার গৃহিণী যান নি। তার কারণ পূর্বে বলেছি; আমার শ্বশুরকুল নিজেদের সম্পদে এবং শিল্পপতিত্বের বৈষয়িক গুরুত্বে আপনাদের বৃহৎ মনে করতেন এবং অমৃতদা এম-এ ডিগ্রীর ও একদা দেশসেবকত্বের গৌরবে এঁদের থেকে আপনাকে মহৎ মনে করতেন। ফলে দুইপক্ষের মধ্যে আত্মীয়ের অন্তরঙ্গতার চেয়ে জ্ঞাতিত্বের ঈর্ষা-অবজ্ঞাই

বড় হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিনের মধ্যে স্বল্প যোগাযোগের জন্য সেটা দৈর্ঘ্যে বড় না হলেও গল্পের বাস্তুসাপের মত আকারে ছোট হয়েও প্রকাণ্ড ফণাটা নিয়ে নিরীহভাবেই বেঁচে ছিল।

আমার গৃহিনী ভুরু কুঁচকে বললেন—দাদা! হ্যাঁ, তা সম্পর্কে দাদাও বটে, সম্পর্কও সত্যি বটে। কিন্তু সে তো কালিচরণের ষাটটা বউয়ের ছেলের খোঁজ করলে, পাঁচ ষাটে তিনশো হবে। ও তুমি যাও। লেখক বলে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে। আমাকে করে নি। করলেও আমি যাব না। আমার বাবা কাকাকে যা বলত!

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া তার বউ—! সে তো বিয়ে করেছে বুড়ো বয়সে প্রেম করে। বউ তো মাস্টারী করতো আগে। শুনেছি খুব ফ্যাশানে মেয়ে। লম্বা লম্বা কথা বলে। সে আমার সহ্য হবে না। তোমরা লেখক মানুষ তোমরা যাও। তোমাদের ভাল লাগবে। তবে সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলো বাপু, সে মেয়ে বিশ্বনিন্দুক। বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আর রূপের গুমোরে বিদ্যার গুমোরে অপ্সরী বিদ্যেবতী তো ফেটে পড়েন! আমাকে যে-সে বলে নি, বলেছে, বড়বউদি দেবেনদার বউ।

দেবেনবাবু আমার স্ত্রীর বড় মামাতো ভাই। আমার মামাশ্বশুরেরা বিখ্যাত ধনী। বড় বড় খনির মালিক। কোল মাইন, মাইকা মাইন নিয়ে বিরাট ব্যবসা। তার সঙ্গে তাঁরা ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানাও করেছেন। অমৃতবাবুর সঙ্গে ফায়ার-ক্লে নিয়ে ব্যবসার সম্পর্ক আছে। রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তার বা কুটুম্বতার সম্পর্ক বংশগৌরবে, বিদ্যাগৌরবে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলা যায়, কিন্তু ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পর্ক যেখানে, সেখানে সেই যে একটা কথা আছে—'ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষ' বলে, সেই কথাটাই চরম সত্য হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের একজন নিরক্ষর মানুষ প্রথম জীবনে ভাগাড়ের মরা গরুর চামড়া আর হাড় কুড়িয়ে ব্যবসা শুরু করে বহু লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন। তাঁর ম্যানেজার যিনি ছিলেন তিনি রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি বলে কথা বলতেন। তিনি দূরের কথা—রায়বাহাদুর খেতাব পেয়ে তিনি রাজদরবারে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-রায়বাহাদুর এম-এ পাশ-রায়বাহাদুরদের পাশে বসতেন। এবং তাঁর বাড়ীর নিমন্ত্রণে সকলে যেতেন। সুতরাং ব্যবসাতে নেমে এম-এ পাশ এককালের দেশসেবক, তাঁর ফায়ার-ক্লের খরিদ্দারের কাছে আসবেন এবং মিষ্ট অন্তরঙ্গতায় অন্তরঙ্গ হতে চাইবেন এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। তবে আড়ালে হয় তো ইনিও মন্দ কথা বলেন এবং তিনিও বলেন। দেবেনদা অমৃতদার থেকে কিছু ছোট, কিন্তু অমৃতদার বউ দেবেনদার বউ থেকে অনেক তরুণী, হয় তো সুন্দরী আধুনিকাও বটেন, তার উপর তিনি না কি মাস্টারী করতেন, অর্থাৎ শিক্ষিতা, পাশ করা মেয়ে, সুতরাং দেবেনদার বউয়ের কানে কথা চ্যাটাং চ্যাটাং ঠেকবারই কথা এবং চোখে এই আধুনিকার (তরুণী রূপসীটির) বেশভূষা, প্রসাধন, স্মার্টনেস সব কিছুই ফ্যাশানোদ্ধত বলেও মনে হতে পারে স্বাভাবিকভাবে।

আমি মনে মনে হাসতে হাসতেই গেলাম।

অমৃতদা সবান্ধবে বসে ছিলেন—দেবেনদাও ছিলেন, দেবেনদাই বললেন—এই এসে গেছে।

অমৃতদা এসে হাত ধরে আমাকে কিছু বললেন না—ডাকতে লাগলেন মণিবউদিকে।

—কোথায় গেলে। ওগো। ওগে ।

বোধহয় কাছেই ছিলেন কোথাও মণি বউদি। ঘরে ঢুকে বললেন—এই তো গেলুম—এরই মধ্যে ওগো-ওগো। কি ?

অমৃতদা বললেন—'সংসার-স্যাভ্যাল যুদ্ধে ওগো আমাদের ওগো ; একান্ত ভরসা সখি, তোমারই এ্যাডমিরাল টোগো।' বুঝেছ। নাও—ইনিই আমাদের—

সহাস্যে মণিবউদি বললেন—আসুন। অত্যাধুনিকা সুন্দরী তরুণী মণি বউদি, শুধু সামনের দাঁত দুটি উঁচু। হাসলে বেশী উঁচু দেখায় কিন্তু খারাপ লাগে না। আমার কিন্তু বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ইনিই মণি-বউদি ?

দুই

অবাক হয়ে গেলাম। ইনিই মণি-বউদি ? বিচিত্র বিস্ময়। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল—খুব চওড়াপাড় তাঁতের শাড়ী পরে কাঁধে দামী এবং শৌখীন শান্তিনিকেতনী ঝোলা ঝুলিয়ে একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের তরুণী দুপুরবেলা হেঁটে চলেছেন কলকাতার দ্বিপ্রহরের রাজপথ ধরে, তাঁরও সামনের দাঁত দুটি এমনি উঁচু। দুপুরবেলা রাজপথে লোকজনের যাতায়াত কমে চিরকালই আসে ; ভিড় পাতলা হয়। সেকালে সেকালের মতোই হতো। একালে একালের মত হয়। তখন ১৯৪২ সাল চলছে। তখনও বোমা পড়েনি, সময়টা ছিল গরমের সময়। কলকাতার লোকের একটা অংশ তখন বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মফস্বল শহরে ভিড় জমিয়ে সে কালের 'ড্যাঞ্চিবাবু' নামে খ্যাত হয়ে থাকলেও কলকাতায় ভিড় মোটামুটি তখনও ছিল। এবং দুপুরের দিকে বেলা সাড়ে এগারটার পর থেকে বেলা তিনটে, গ্রীষ্মের সময় চারটে পর্যন্ত, একটা সময় আপিস ও বাজার অঞ্চলের বাইরের অঞ্চলগুলোতে একটা অলস নিশ্চলতার খাঁ খাঁ ভাব ফুটে উঠত। রাস্তায়-ঘাটে ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দোকানপাট কিছু কিছু বন্ধ হত। কিছু কিছু দোকানের দরজা ভেজানো থাকত। দোকানী বসে ঢুলত, না হয় কোন একখানা বই খুলে বসে থাকত। রেস্টুরেন্টগুলো খাঁ খাঁ করত। কুকুর, গরুগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে পথের দুপাশে বসে ঝিমুত। নির্জন রোয়াকে বসে মস্তানের দল বিড়ি টানত এবং অলস মন্থর সুরে ও কণ্ঠে রসিকতা করত। মধ্যে মধ্যে দু'খানা চারখানা গাড়ী হর্ন বাজিয়ে রাস্তার নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে একটু সচকিত করে দিয়ে চলে যেত। কখনও বা ঠুন-ঠুন শব্দ তুলে যেত এক-আধখানা রিক্সা। এবং দু'চারখানা সেকালের থার্ডক্লাস ঘোড়ার-গাড়ীর আওয়াজও উঠত মধ্যে মধ্যে। তখনও ঘোড়ার-গাড়ী যায়নি। তাই বা কেন—মধ্যবিত্ত সমাজে ঘোড়ার-গাড়ীর আধিপত্য পড়ন্ত জমিদার বাড়ীর প্রতাপের মত বজায় ছিল। বরঞ্চ যুদ্ধের বাজারে মোটর আমদানীতে মন্দা পড়ায় কিছুটা যেন আবার চনমন করে

উঠেছিল।

এমনি সময়ে খুব চওড়াপাড় তাঁতের শাড়ীপরা শান্তিনিকেতনি ঝোলা কাঁধে শৌখীন চটি পায়ে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখতাম—হেঁটে চলে যাচ্ছেন। সেটা অল্পদিন আগের ঘটনা ছিল তখন। জনবিরল পথে সুন্দরী তরুণী অবশ্য চোখ ও দৃষ্টিকে চকিত ও আকৃষ্ট করেই থাকে; এ মেয়েটিও করেছিল। বলতে গেলে একটু বেশী চকিত ও আকৃষ্ট করেছিল। কারণ ছিল—তাঁর বেশ, ভূষা, আচরণ ও চালচলনের মধ্যে প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার এমন একটি বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছিল যে তা শুধু দৃষ্টিকেই আকর্ষণ করত না, সঙ্গে সঙ্গে মনকে সবেগে নাড়া দিয়ে কুমোরের চাকের মত ঘুরিয়ে দিত, যার ফলে চাকের মাথার মাটি থেকে যেমন গেলাস বা হাঁড়ি বা খুরি গড়ে ওঠে তেমনিভাবেই একটা প্রশ্ন চেহারা নিয়ে গড়ে উঠত —মন বলত—"আরে! এটা কিরকম হ'ল! শান্তিনিকেতনী ঝোলা এবং চটির সঙ্গে হাতীপাঞ্জা লালপেড়ে শাড়ী পুরনো ঢঙে পরা। মাথায় প্রচুর চুলে বাঁধা ঝুঁটি-খোঁপায় সাঁওতালী ঢঙ-এর রূপোর চেনে ঝুমকো ঝোলানো খোঁপাভরণ; তার সঙ্গে সিঁথিতে সিন্দুরের ঘটা; গলায় পলার মালা—যা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং তার সঙ্গে হাতে শাঁখা ও নোয়া; এ কিরকম হল!" অথচ অনায়াসে মানিয়ে গেছে মেয়েটির চাল-চলনের স্বচ্ছন্দতায়। আরও আছে।

প্রথম দিন ওঁকে দেখেছিলাম গৌড়ীয় মঠের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এসে পড়েছে বাগবাজারে, সেই রাস্তা ধরে বাগবাজার স্ট্রীটে উঠলেন। ছিল গরমকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। বাড়ীর কলে জল ছিল না, চৌবাচ্চায় জলের এমন অবস্থা যে দুপুরবেলা খাবার পর হাত ধোয়াটা কোন মতে হলে বাঁচি। তাই যাচ্ছিলাম গঙ্গার দিকে। গঙ্গাস্নান করে আসব। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে সাড়ে এগারটার সময় গঙ্গাস্নানে যাওয়া-আসা সহজ কাজ ছিল না। বিরক্তি-ভরেই হাঁটছিলাম। এরই মধ্যে বাঁদিকের রাস্তা থেকে বেঁটে ছাতা মাথায় মেয়েটি বাগবাজারে পৌঁছে আমার সামনে পশ্চিমমুখ করে একরকম ইঞ্জিনের মতই আমাকে একটা আকর্ষণের জোরে টান দিলেন। পিছন থেকে তাঁর চুলের ঝুঁটি-খোঁপাতে রূপোর ফুলে ঝোলানো চেনগুলির দোলা অবশ্যই আমার মনকে দোলা দিয়েছিল ১৯৪২ সালে। তখন আমি মাত্র চুয়াল্লিশ। শুধু চেন এবং সাঁওতালী ঢঙের ফুলই নয়, তাঁর হাতিপাঞ্জা পাড়ের ডগডগে রঙও মনে ছায়া ফেলেছিল। তার সঙ্গে তাঁর চলনভঙ্গি। সে ভঙ্গিতেও একটা আকর্ষণী ছিল। সারা অঙ্গ যেন দুলত। না, দুলত বলব না। ঠমক-লাগা কথাটা ব্যবহার করব। তুলসীদাসের ভজনে আছে—'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পায়জনিয়া।' নিজের গতিকে দ্রুততর করে-ছিলাম। সকলেই করে। যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে দেখতে সকলেই চায়। আমিও তাই চেয়েছিলাম, তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে কোন দোকানের ধারে কোন ছুতোয় দাঁড়িয়ে দেখে নেব। কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। বাগবাজারের বাজার যেটা, সেই বাজারের কোন দোকান থেকে অথবা বাজার ঢুকবার পথের মোড় থেকে একটি তরুণ-কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল—এ-ই চলল 'দন্তমনোরঞ্জিনীসুহাসিনী টুথ পেস্ট'—। এবং এমন-

ভাবে বললে যে, সকলেই প্রায় হেসে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মুখবর্তিনী-হংসগামিনী ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। বোধ হয় দেখতে চাইলেন বক্তাকে। কিন্তু সে তো হয় না, দেখতে এমন ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। 'হাওয়া হয়ে যাওয়া' বলে একটা কথা আছে; এমন ক্ষেত্রে যে এমন ধরণের কথা ছুঁড়ে মারে, সে মেরে আর দাঁড়িয়ে থাকে না, মেরেই 'হাওয়া হয়ে যায়'। যে বলেছিল সে বোধ হয় মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু আমার লাভ হয়েছিল। আমি একেবারে তাঁকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিলাম, দূরত্ব ছিল মাত্র হাত পাঁচ-ছয়, তার বেশী নয়। দেখলাম তাঁর সামনের দাঁত দুটি অল্প-একটু উঁচু, কিন্তু উঁচু হলেও বাকীগুলিকে নিয়ে এমনই আনুপাতিক সামঞ্জস্য রেখে সাজানো যে, ভারী ভাল লাগে। আরও যেটা চোখে পড়েছিল এবং যেটা আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছিল সেটা হল তাঁর মুখের হাসি, দেখলাম ঠোঁট দুটিতে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠেছে। গালে দুটি টোল পড়েছে তাতে। মনে হল, 'দন্তমনোরঞ্জিনীসুহাসিনী টুথ পেস্টের' অন্তর্হিত অর্থের সঙ্গে সত্যই একটা মিল আছে এবং তাঁরও রস-বোধ আছে যার জন্যে এমন কথাটা তাঁকে খুশী না করে পারেনি। তারপরই মনে হয়েছিল—না। হাসির মধ্যে এতবড় অবজ্ঞা বা ঘৃণা আর হয় না। থুথু ফেলে অবজ্ঞা প্রকাশ করাও এর থেকে হাল্কা ব্যাপার। তিনি এসে দাঁড়ালেন বাগবাজার স্ট্রীট এবং চিৎপুর রোডের জংসনে, দক্ষিণ দিকে যে কালীবাড়িটি আছে সেখানে। কথা বলতে লাগলেন পুরুতের সঙ্গে। আমার আর দাঁড়াবার সময়ও ছিল না, উপায়ও ছিল না; মাথার উপর রোদ চড়ছে, সঙ্গে আছে বাড়ীর ঠাকুর আর চাকর, একসঙ্গেই স্নান করতে এসেছি। গৃহিণী হেঁসেল নিয়ে বসে আছেন। গঙ্গাস্নান থেকে ফিরবার পথে ভাল করে এদিক-ওদিক দেখেও তাঁকে চোখে পড়ল না। এবং ততক্ষণে গঙ্গাস্নানের সঙ্গেই বোধ হয় কৌতূহল অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল।

অমৃতদার বাড়ীতে মণি-বউদিকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম, কিন্তু মণি-বউদি আদৌ বিস্মিত হলেন না। সেই মুখ, সেই ঈষৎ উঁচু দাঁত এবং পদক্ষেপের ভঙ্গির মধ্যে সেই সারা অঙ্গে দোলনলাগা ঢঙের মিল থাকলেও এ-মেয়ে সেই মেয়ে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগল আমার। ওদিকে তাঁর বিস্ময়লেশহীন মুখ নিয়ে তিনি একরকম চ্যালেঞ্জ দিয়ে দাঁড়ালেন।

ইনি অর্থাৎ মণি-বউদি অবিকল সেই মেয়েটির মত দেখতে হলেও আজকের পোশাকে-পরিচ্ছদে, রকমে-সকমে একেবারে স্বতন্ত্র। এ মণি-বউদি একেবারে ১৯৪২ সালের নিখুঁত মডার্ন মেয়ে; ফেরতা দিয়ে সুন্দর সাদা-জমির উপর সূক্ষ্ম সুচে তোলা বুটিদার ঢাকাইশাড়ী পরেছেন। গায়ে টকটকে লাল বর্ডার দেওয়া সিল্কের ব্লাউজ; পাতা কেটে চুলের বিন্যাস; মুখে স্নো-পাউডারের চড়া সূক্ষ্ম শুভ্রতা, চোখে সুর্মা বা কাজল, তার সঙ্গে ঠোঁট দুটিতে লিপস্টিকের রঞ্জনী; হাতে চুড়ির গোছা, গলায় পাথর-বসানো নেকলেসটির ছটা আজও মনে পড়ছে আমার। আমার এই বিস্ময়কে উপহাস করে তিনি বলে উঠলেন, আপনিই আমার প্রিয় লেখক এবং নন্দাই? ও মা? এ যে মনে আঁকা ছবির সঙ্গে একেবারে মেলে না।

আমি হেসে বললাম, আপনি বুঝি আমাকে অমৃতবাবুর চেয়েও দেখতে সুপুরুষ ভেবেছিলেন ?

অমৃতবাবু বলেছিলেন—ওহে বাপু আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ, তোমার থেকে বয়সে অন্তত আট-দশ বছরের বড়। এবং তোমার স্ত্রীর দাদা। আমাকে দাদা বলবে।

আঘাত দিতে ইচ্ছে হল কিন্তু এই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তা পারলাম না। মেয়েটির অভ্যর্থনা এবং কথাবার্তার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল সেটি একটি প্রসন্ন প্রদীপের মত জ্বলছিল —তাকে নিভিয়ে দিতে অথবা ফুঁ দিয়ে কাঁপিয়ে দিতে ভাল লাগল না। মনের মধ্যে তখন তাঁর-মনে-আঁকা আমার ছবিটির সম্পর্কে অনেক সকৌতুক কল্পনা করছিলাম আমি।

মণি-বউদি বলে উঠলেন—তার জন্যে হুঙ্কার ছাড়তে হবে না। তোমাকে, সে উনি নিশ্চয় বলবেন । বলবেন না ?

ইচ্ছে হল বলি, কথাটার মীমাংসা উঁমাকে ডেকে করলেই ভাল হয়। সে যদি দাদা বলে ডেকে বিগলিত হয়, তবে অবশ্যই আমি বলব। কিন্তু তার আগেই মণি-বউদি বাকী কথাটা শেষ করলেন—তোমার ছোটবোনের স্বামী হিসাবে তোমাকে দাদা বলুন চাই না-বলুন, আমার জন্যে তোমাকে দাদা বলবেন। কারণ আমি শালাজ এবং বউদি এক-আধারে দু-ই হব। বলে মুখ টিপে হাসলেন। সে হাসিতে দুই গালে দুটি টোল পড়ল এবং হাসিতে যে মিষ্টতা ফুটে উঠল তা সেদিনের সেই মেয়েটির সেই মিষ্টি হাসিকে মনে করিয়ে দিয়েই আর এ-হাসি ক্ষান্ত হল না, সে-হাসি যেন এক মুখেরই এক হাসি হয়ে জ্যামিতির দুটি ত্রিভুজের মত এক হয়ে মিলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাটি কেটেছিল ভাল। অমৃতদাকেও ভাল লেগেছিল। অমৃতদাকে লোকে পণ্ডিত জানে। প্রাক্তন দেশকর্মীদের যে একটি পৃষ্ঠপোষকসুলভ অহঙ্কৃত স্নেহ বা করুণা বিতরণের ঔদ্ধত্য থাকে, তাঁর চরিত্রে তা কিছু কিছু থাকলেও এখন সে-সব ঘষেমেজে সমান মসৃণ হয়ে এসেছে। এখন যেটা আছে সেটা মোটামুটি সম্পদের হাঁকডাক। অহরহই তিনি এটা দেখাতে ওটা দেখাতে ব্যস্ত। ফার্নিচারগুলো কোথা থেকে কেনা, মেঝের মারবেলের বিশেষত্ব কি, কোন্ কোন মেঝের মারবেল খাস ইটালিয়ান, এমন কি বাথরুমে যে পোরসেলিন টাইল্‌স্ বসিয়েছেন, তা কিভাবে সংগ্রহ করেছেন, এতেই তিনি মশগুল। কোনমতে বা কোনক্রমে যদি মণি-বউদির ধাক্কায় এই চক্র থেকে ছিটকে বেরুচ্ছিলেন তো সোজা গিয়ে আবার একটা অনুরূপ চক্রে ঢুকে ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন; সে চক্রটা হল সরকারী মহলের স্পাইর‍্যাল সিঁড়িতে উঠে একেবারে উপরে গোলকধাঁধার মত গোলাকার একটা মহল, যার দু'পাশেই ঘরগুলিতে রাজকর্মচারীদের দপ্তর। যাঁরা খাঁটি দেশকর্মী তাঁদের পক্ষে সেকালে এ মহল ছিল শৌণ্ডিকালয় বা বেশ্যালয়ের তুল্যই অন্য একটি আলয়, যেখানে পদার্পণ করলে স্মার্ত বিধানে নরকে পতন ছিল অনিবার্য। একালে কিন্তু তা নয়। উল্টে গৌরবের স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মণি-বউদির মুখখানার চেহারা আমার মনে পড়ছে। স্বামী সরকারী মহলের কথা

তুলতেই তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। মণি-বউদির রঙ হলদেটে ফরসা নয়, লালচেও ঠিক নয়, তাঁর দেহবর্ণে সাদার আভাস বেশী। তার উপর পাউডার এবং স্নোর সূক্ষ্ম আস্তরণ বিলেপনে মর্মরশুভ্র দেখাচ্ছিল। সে মুখ লাল হয়ে উঠল। দুটি ভ্রূর মাঝখানে ঠিক নাকের উপরে ক'টি কুঞ্চন রেখাও দেখা যাচ্ছিল। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না এ গোলকধাঁধা থেকে স্বামীকে বের করবেন কি করে? হঠাৎ পথ পেলেন। বললেন—আমাকে না ওঁকে। বললেন—একটা কথা বলব কিন্তু। রাগ করো না যেন। করলে আমি নাচার। সেদিন কিন্তু ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দী তিনজন বাড়িতে এলেন তোমার জন্মদিনে। আর তুমি কড়া কথা বলে দিলে? এগুলো কিন্তু ঠিক নয়।

হা হা করে হেসে উঠলেন অমৃতদা। তিনি প্রায় বিগলিত হয়ে গিয়েছিলেন। হাসি থামিয়ে কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু বউদি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—এইবার সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করব কিন্তু। করি?

—কি? কোন্ কথা। অমৃতদা হাসি থামিয়ে স্ত্রীর মুখপানে চাইলেন।

—সেদিন দুইপুরুষ দেখে ফেরবার পথে যে কথা হয়েছিল!

—ও। তা বেশ তো। কর না।

—আচ্ছা, সত্যি কথা বলবেন লেখক-মশাই। নূটবিহারীর চরিত্রটি কোথায় পেলেন? ওটি কার চরিত্রের ছায়া নিয়ে গড়েছেন? ওঁর নয়?

আমি কি উত্তর দেব খুঁজে পাইনি। আবার হো হো করে হেসে উঠতেও পারিনি।

দুইপুরুষের নূটবিহারী,—অমৃতদা?

আমার বিস্ময় বা নীরবতায় তাঁদের কিছু এসে-গেল না। মণি-বউদি প্রমাণ করে দিলেন যে অমৃতদার চরিত্রের ছায়া থেকেই দুইপুরুষের নূটবিহারী চরিত্র আমি গড়ে তুলেছি। মণি-বউদি এককালে শিক্ষিকা ছিলেন শুনেছিলাম; অমৃতদা নূটবিহারী—এই তথ্যটিকে, সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেই, সেদিন তিনি তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। কোন বক্র অর্থকে প্রচ্ছন্ন রেখে এ-কথা বলছি না। সত্যসত্যই মণি-বউদির বিশ্লেষণী ভঙ্গিটি ভাল লেগেছিল আমার। এবং কয়েক জায়গাতেই চরিত্রচিত্রণে ত্রুটিও তিনি তুলে ধরেছিলেন। তখন নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসছেন, বসছেন; চাকর ট্রের উপর শীতল পানীয় নিয়ে গিয়ে সামনে ধরছে। মণি-বউদি কথা বলতে বলতেই তাতে ছেদ টেনে অভ্যর্থনা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাতেও ছেদ টেনে বিশ্লেষণীতে ফিরে আসছেন। সে বেশ সাবলীলতার সঙ্গে। মনে পড়ছে, আমার সম্পর্কে ভায়রাভাই সমরদা, সস্ত্রীক এসেছিলেন কথার মাঝখানে। তখন মণি-বউদি বলেছিলেন, নূটুবাবুর সঙ্গে ওঁর চরিত্র মিলিয়ে দেখুন; প্রথম প্রথম যখন উনি এম-এ পাশ করে দেশ দেশ করে বেকার রয়েছেন, এর দোরে, ওর দোরে শেয়ার বিক্রী করে ফিরেছেন, তখন আত্মীয়দের সঙ্গে এতটুকু মনের মিল নেই; যা তা কথা বলতেন; লোকে বলতো, লোকটা দুর্বাসা। এই-এই-এই সমরবাবু এসেছেন, উনি সাক্ষী দেবেন, আসুন, আসুন; আসুন ভাই বীণাদি, আসুন। বসুন। খুব জমেছে কথা। আমি বলছি, উনি নূটবিহারীর চরিত্র এঁকেছেন

আমার কর্তাটিকে দেখে। খুব ইনটারেস্টিং নয়? বলুন তো মেলে কিনা? যে মানুষ ধনীদের ছায়া মাড়াতো না, গভর্নমেণ্ট অফিসিয়েলদের সঙ্গে যাঁর ছিল নন-কো-অপারেশন; এখন তিনি নিজে পয়সা করেছেন এবং মিনিস্টাররা তাঁর বন্ধু। মিলিয়ে নিন। তবে খুব ক্লেভার। এ বলতেই হবে। বিমলা আর কল্যাণীর ট্রাঙ্গেলের মধ্যে নুটুকে প্রেস করে এমন ফ্রেমে এঁটে দিয়েছেন যে আসল মানুষটিকে ওই ফ্রেমের বাইরে এনে চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য দেখতেই পায় না কেউ। আর দেখতে চায়ও না কেউ। কি? ও মা, কার গাড়ী থামল? মনে হচ্ছে খুব ভারী-গাড়ী থামল? কে এল বল তো গো? রায়বাহাদুর এলেন বোধ হয়। আসছি আমি—

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলামই না, তার সঙ্গে ভাবছিলামও। এই মণি-বউদি আর সেই মেয়ে কি এক হয় না, হতে পারে। সে-মেয়েকে তো একদিনই দেখি নি আমি। আরও কয়েকদিন—বেশ-ভূষায়, সেই ঢঙেঢাঙে, চালে-চলনে দেখেছি বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে। যাঁরা এইসব গঙ্গার ঘাটের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন, অপরাহ্ণ বেলা পড়লেই এই ঘাটের উপর ছোটখাটো পাঠের আসর বসে যায়। একজন পাঠক এসে যান তাঁর গ্রন্থ, আসন, গ্রন্থ রাখবার ছোট্ট একটি চৌকী, একটি পঞ্চপাত্র ও একটি কুশী নিয়ে। এবং বসে আচমন করে গ্রন্থপাঠ করতে লেগে যান:

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্/হংসং সরস্বতীংচৈব ততজয়োমুদীরয়েৎ—ভাগবত হোক, মহাভারত হোক, চৈতন্যলীলা হোক—পাঠ শুরু করেন এবং আপনা-আপনি একটি দুটি করে শ্রোতা এসে বসে যায় চারি পাশে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই গঙ্গার ঘাটের নৌকায় পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা, (সে খড়ের, ইটের, বালির, ইলিশ মাছের) নারীসন্ধানী পুরুষ—পুরুষসন্ধানী নারী, এবং খবরের কাগজ হাতে বায়ুসেবীদের জীবনস্রোতের মাঝখানে ধর্মচর্চার একটি দ্বীপের মত গড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হ'তে হ'তে এ আসর শেষ হয়। শেষ হয় আলোর জন্যে। শ্রোতার মধ্যে মেয়ের দলই বেশী। তারা কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে চলে যায়। এই ধর্মাকাঙ্ক্ষিনীদের মধ্যে কিছু পুরুষ-সন্ধানী ছদ্মবেশিনী থাকেন—যাঁরা উঠবার সময় আঁচলের ঝটকায় একটা আহ্বানের ইশারা জানিয়ে চলতে শুরু করেন। চলেন আর ফিরে তাকান। দেখে নেন কে আসছে। ওদিকে ঘাটের উপর যে দেবালয়গুলি আছে—সেখানে আরতির ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। নতুন মুখের আমদানি হয়। শনিবারে শনি সত্যনারায়ণ হয়; পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ হয়। সে আবার বিশেষ সমারোহের দিন। সেদিন ভিড় আরও বেশী জমে।

এই এমনি একটি আসরে তাঁকে বসে থাকতে দেখেছি। ঠিক আসরে নয়। একটু স্বাতন্ত্র্য রেখে। কিন্তু এমন স্বাতন্ত্র্য নয় যাতে করে এই মণি-বউদি এবং ওই সাধারণ সত্যনারায়ণ করা মেয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও কোন এক অকাট্য প্রমাণে দুইকে এক বলে প্রমাণ করা যায়। মনে পড়েছে সেই মহিলাটি ভিড় থেকে খানিকটা স'রে একখানা খবরের কাগজ পেতে বসেছিলেন। এবং ঠিক যে পাঠই শুনছিলেন এমনও ঠিক বলা যায় না,

কারণ তাঁর দৃষ্টি পাঠকটির দিকে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল—সোজা দক্ষিণমুখে। গঙ্গার প্রবাহ যে তরঙ্গ তুলে বয়ে যাচ্ছিল—তাঁর দৃষ্টি যেন সেই স্রোতে ভাসছিল।

আমি বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকান নি।

আরও দেখেছি।

বাগবাজার স্ট্রীট ধরে ফিরে যাচ্ছিলেন সন্ধ্যার পর।

একদিন নয়, দু-দিন।

মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

তার অর্থ খুব পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়নি। দৃষ্টিতে কিছু যেন ছিল।

মণি বউদির সঙ্গে তার হুবহু মিল—চেহারার দিক দিয়ে। কিন্তু এই দুই-পুরুষের নটু চরিত্র বিশ্লেষণরতা মণি-বউদির সঙ্গে সে মেয়ের প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

মণি-বউদির কাপড়ের পাড়টার দিকে তাকালাম, জমির দিকে তাকালাম। সুন্দর বুটিদার সাদা জমি উৎকৃষ্ট ঢাকাই শাড়ী। পাড়টা দু' আঙুলের বেশী চওড়া নয়। ব্লাউজটা লাল সাটিনের।

তাঁর শাড়ীখানা তাঁতের শাড়ী হলেও ঢাকাই ছিল না। ফেরতা দিয়েও পরে ছিলেন না তিনি, এবং তাঁর শাড়ীর পাড় ছিল আধ হাতেরও বেশী চওড়া, তার রং একদিন ছিল লাল, একদিন ছিল তিনরঙ্গা বা চাররঙ্গা। আর একদিন বা দুদিন—ওই লালই ছিল। হাতীপাঞ্জা লালপেড়ে শাড়ী।

মণি-বউদি তখন দুই পুরুষ সেরে ধাত্রী-দেবতা নিয়ে পড়েছেন। বলছেন—পিসীমা খুব রিয়েল আর গ্রেট। কিন্তু মায়ের কথায় একেবারে পঞ্চমুখ উনি। যাকে বলে মহিমময়ী—।

হেসে উঠে বললেন—ননদকে আমার আনলেন না কেন? একবার যাচাই করে নিতাম—ছোট্ট গৌরীটির সঙ্গে মেলে কিনা?

আমি কিছুতেই একটা মীমাংসায় আসতে পারিনি।

সে মীমাংসায় এলাম—আর কিছুদিন পর।

তিন

সেদিন আর ক'টা দিন পরের কথাটি বলবার আগে তার মাঝের কটা দিনের কথা বলে নিতে হবে।

এই মাঝের দিনকতক আমার একটা নতুন বাতিক দাঁড়িয়েছিল, দুপুরবেলা বাগবাজার স্ট্রীট এবং ওই গৌড়ীয় মঠের রাস্তাটির জংশনের কাছে দাঁড়ানো। এবং বিকেলবেলা বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটে পাঠের আসরের আশে-পাশে ঘোরা। কিন্তু না; সেই মণি-বউদির সঙ্গে আশ্চর্য-সাদৃশ্যযুক্তা রহস্যময়ীর আর দেখা পাইনি। সন্দেহটা অনেকটা তাতেই

মিটেছিল ; মনে হয়েছিল, তিনি এবং ইনি অর্থাৎ মণি-বউদি দুইয়েই এক ও একেই দুই ? আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর মণি-বউদি একদিকের রাস্তা ছেড়েছেন, পাছে দেখা হয়ে যায়। তবে প্রশ্ন জেগেছিল—কেন ? দেখা-হওয়াটা এড়াতে চান কেন ? এবং এমনভাবেই বা উনি ঘোরেন কেন, ছদ্মবেশিনীর মত ?

মানুষের মনের মধ্যে একজন করে চোরও আছে, একজন করে পুলিশও আছে। একই সঙ্গেই আছে। ফলে কখনও বা চুরি করতে গিয়ে অপরের চুরি ধরে পুলিশ হিসেবে পুরস্কৃত হই, কখনও বা পুলিশী করতে গিয়ে চুরির বস্তু দেখে চুরি করে বসি। কিম্বা চোর ধরতে গিয়ে চুরির বামাল চুরি করে চোরের হাতেই ধরা পড়ে চোর বনে যাই। সঙ্গে সঙ্গে পালা-বদলও হয়ে যায়, দেখি যে-চোরকে ধরতে এসেছিলাম, সে-ই পুলিশ হয়ে গেছে। আমি হয়েছি চোর।

মণি-বউদিকে চোর হিসেবে ধরতে গিয়ে একদিন তাঁরই কাছে চোর অপবাদ নিয়ে মাথা হেঁট করে ফিরে এলাম।

ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলা দরকার। ওই প্রথম দেখা হওয়ার দিনের পর অমৃতদা এবং মণি-বউদি যেন আমার সঙ্গে মেলামেশার দিকে একটু বেশী ঝুঁকে পড়লেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার নিমন্ত্রণ পাঠালেন। এবার পত্র নিয়ে যিনি এলেন, তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে আমরা বলি স্মার্ট-ইয়ংম্যান—তাই।

সুন্দর সুট পরা একজন যুবক—তিরিশ বা পঁয়ত্রিশের মত বয়স, দেখতেও তিনি সুদর্শন এবং সুপুরুষ। অনেক সময় সুদর্শন হলেও সুপুরুষ হয় না, চেহারা হয় নরম-নরম কমলকুমারের মত। এ তা নয়। নামটি কমলকুমার হলেও বেশ শক্তপোক্ত দীর্ঘাকৃতি মানুষ। আগেই বলেছি, মণির আসল নাম মণি-দি নয় ; অমৃতদাদাও অমৃতলাল নন। এ নামগুলি বদলে দিয়েছি, কিন্তু 'কমলকুমারের' নাম খাঁটি সত্য। কমলকুমার অমৃতদা-র মামাতো ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ ভাইপো। প্রথমেই বলেছি অমৃতদা—যেটেরা কালিচরণের প্রপৌত্র, কুলীনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। যাঁরা বাংলার কৌলীন্য-প্রথার কথা জানেন, তাঁরা জানেন, কুলীন সন্তানদের সেকালে পিতা ছিলেন, পিতামহ ইত্যাদি ছিলেন এবং প্রকাণ্ড বংশলতাশ্রয়ী একটি কৌলীন্যমহিমাও ছিল ; কিন্তু তাঁদের পৈত্রিক ভিটা বা পৈতৃক বলে কোন ভূমি কারও ছিল না। তাঁরা জন্মাতেন মাতুলালয়ে। যৌবন প্রাপ্ত হলে অনেকগুলি কুলীন কুমারীর পাণিগ্রহণ করে পালাক্রমে তাদের গৃহে জামাতা সমাদরে কাটিয়ে দিতেন বৎসরটা। যেটেরা কালিচরণ ষাটটা বিবাহ করেছিলেন—সেটা বড় বেশী করেছিলেন। সাধারণত ছটা বিবাহ ছিল হিসাবমাফিক, অভিজাত ব্যাপার ; বছরে দুবার শ্বশুরালয় এসে একমাস করে কাটিয়ে পাওনা-গণ্ডা আদায় করে অন্য স্ত্রীর বাড়ী গমন। এর বেশী হলে ঠিক হিসেব-মত হ'ত না। থাক থাক। মোট কথা কুলীনের ছেলেদের বাবার ভিটে নেই, তারা কাকের বাসায় কোকিলের ছানার মত মামার বাড়িতে বড় হয়। মামারা একটা ভিটে দেয়।

অমৃতদাও মামার বাড়ীতে মানুষ। মামার বাড়ী বাঁকড়ো জেলায়। অমৃতদার বাবার

তিন বিবাহ ছিল। অমৃতদার মামাতো ভাইরা সম্ভ্রান্ত জোতদার ছিলেন। কমলকুমার সেই বাড়ীর বড়ছেলে। এবং বর্তমানে সে-ই অমৃতদার সব। খানসামা বা পিওন থেকে পি-এ এবং জি-এম অর্থাৎ পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত—সব।

এই কমলকুমার এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করে বললে, একবার যেতে হবে আজ।

সে প্রায় জিরিবিরি করে (ওর মানে নেই—ধ্বনি আছে) জড়িয়ে ধরলে—যেতেই হবে; আমি না গেলে তাকে বিব্রত হতে হবে। কারণ খুড়ীমা চটবেন এবং খুড়ীমা চটলে খুড়ো-মশায় অর্থাৎ অমৃতবাবু হয়তো ফটকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবেন—'মাইনেপত্র মিটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও এক্ষুনি।' সুতরাং আমাকে যেতেই হবে, এই তার অনুরোধ। কি কাজ সে তা বলতে পারে না।

যেতে হয়েছিল। গিয়ে কাজ শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁদের পাড়াতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে, তার ফাইন্যাল বিচার-বোর্ডে-এ মণি-বউদি আছেন, পাড়ার একজন আছেন, তার সঙ্গে আমাকেও থাকতে হবে। বিচারের ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার বিতরণ হবে। পুরস্কার দেবেন মণি-বউদি, সভাপতি অমৃতদা, আমাকে হতে হবে প্রধান অতিথি। পুরস্কারের টাকা সবটাই দিয়েছেন অমৃতদা। তিনি পাড়ার পেট্রন। এবং আমার দিকের সম্মতিও তিনিই দিয়েছেন, কারণ তিনি আমার বিগ ব্রাদার-ইন-ল অর্থাৎ সম্পর্কে বড় সম্বন্ধী, স্ত্রীর বড়ভাই। মজার কথা এই যে, গিয়ে এসব শুনে একটু আপত্তি করলাম কিন্তু দানা বাঁধল না, মণি-বউদি জল ঢেলে দানা গলিয়ে জলে গুলে দিলেন।

এর দিন-চারেক পর আবার দেখা হল। এবার মণি-বউদি এবং অমৃতদা আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে এলেন; এসে প্রথমেই ঢুকলেন শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ী। সেখানে ছবি কিনলেন। কমল সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল; সে-ই আমার বাসায় এসে খবরটা দিয়ে গেল এবং যামিনীদার বাড়ী আসতে মণি-বউদির নির্দেশ জানালে, বললে—কাকী বললেন। কাকার স্ত্রী কাকী তা বলতে হবে না; শব্দটা শহরে না চললেও পাড়াগাঁয়ে, বিশেষতঃ রাঢ়দেশে, দেশজুড়ে চলে। কাকীর শেষে 'মা' পর্যন্ত জোড়ে না।

ওদিকে যামিনীদার বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে অমৃতদা হাঁক পেড়ে আমাকে ডাকতে শুরু করেছিলেন, আমার না গিয়ে উপায় ছিল না। অমৃতদার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যামিনীদা খোদ। যামিনীদার দোতলার বারান্দা এবং আমার বাসার দোতলার বারান্দা মুখোমুখি। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মণি-বউদি। মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করতে হবে। সেটা এই—যামিনীদার পৈতৃক বাসভূমি হ'ল বাঁকুড়া জেলায়। সেই জেলার সম্পর্ক ধরে অমৃতদা জেলা-জ্ঞাতিত্বের দাবীতে যামিনীদার আপনজন হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এবং তাঁর উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়ছেন এবং মণি-বউদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। যামিনীদারও দেশের লোক সম্পর্কে অন্তরে একফালি নরম সবুজ জমি আছে, রাঢ়ের লাল ধুলো সর্বাঙ্গে মেখে যারা কাছে আসে তাদের ওইখানটিতে আসন পেতে বসতে দেন।

যেতে হল আমাকে। অমৃতদা তখন খুব জমিয়েছেন। এ ক্ষমতাটা ছিল অমৃতদার। সোনামুখী পাত্রসায়র প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলির গল্প জুড়ে দিয়েছেন। এবং বয়স হিসেব করে, যামিনীদা থেকে বয়সে বড় হিসেবে জ্যেষ্ঠের দাবী মানতে হবে গোছের একটা নীরব ডিগ্রী যেন জারী করে ফেলেছেন। আমায় দেখিয়ে বললেন—আপনি আমার দেশের মানুষ আর এই লেখকটি আমার আপনজন, ভে-রী স্ব-ইট রিলেশন—ব্রাদার-ইন-ল।

আপনার ছবি রাখব দেওয়ালে, এবং আমার ব্রাদার ইন-ল'র বই রাখব আলমারিতে। বুঝেছেন! সুন্দর করে বাঁধিয়ে নেব।

যামিনীদা চুপচাপ মানুষ; অসাধারণ নয়, অনন্যসাধারণ তাঁর সহনশীলতা; চুপ করেই রইলেন তিনি সমস্তক্ষণটা। ছবি কেনা শেষ করে অমৃতদা এসে উঠলেন আমার বাড়ী। কমলকুমার মণি-বউদির হাতে একটা কাগজের বাক্স তুলে দিলে। এবং ড্রাইভারটি একটা প্যাকেট নিয়ে এসে নিচের বসবার ঘরে নামিয়ে দিলে অমৃতদার চেয়ারের পাশে। কমলকুমার ঘরে বসল না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

মণি-বউদি প্যাকেটটা হাতে উপরে চলে গেলেন—আমার গৃহিণী তাঁর ননদের সঙ্গে আলাপ করতে; অমৃতদা বললেন—এ-সব তোমার বই। কিনেছি। লিখে দাও—মণি বউদি ও অমৃতদা শ্রীচরণেষু—না, শ্রদ্ধাভাজনেষু!

অমৃতদা, একালে ধনী হয়েও একটা জিনিস হারান নি, সেটা সোজা কথা বলার স্বভাব। তবে এককালে যেটাকে দরিদ্র দেশকর্মীর মুখে তপস্যার তেজ বলে মনে হ'ত, এখন সেটাকে ধনাঢ্যতার অহঙ্কার বলে মনে হয়, সে অহঙ্কার প্রকাশ করতে কিন্তু তাঁর লজ্জা নেই। বললেন —লোকে দেখবে। মনে প্রশ্ন জাগবে তাদের। তোমার লেখা দেখে নিশ্চয় অবাক হবে। তখন বলব—হি ইজ মাই 'ব্রাদার-ইন-ল'।

মণি-বউদি কিন্তু তা' নন।

কথাটা যেন বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে বললেন—আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। কাউকে বলতে পাবেন না যে বইগুলো আমরা কিনে আপনার কাছে লিখিয়ে নিয়েছি। আর—দু'খানা বই সত্যিসত্যিই প্রেজেন্ট করতে হবে আমাকে।

এরই মধ্যে বলে ফেললেন—আমি ওদের দেখাতে চাই—টাকার কাঁড়ির উপর বসে থাকলেই বড়-মানুষ হয় না। আপনি যে ওদের আমল দেন না, ওদের সঙ্গে মেশেন না, তার জন্যে আপনাকে সত্যিসত্যি শ্রদ্ধা করি।

ওরা মানে হল—অমৃতদা ছাড়া আমার অপর আপনজন, যাঁরা ধন-কৌলীন্যে প্রাচীন কুলীন —তাঁরা। জীবনের একটা প্রতিযোগিতা তাঁদের সঙ্গে অমৃতদার বরাবরই ছিল স্বাভাবিক নিয়মে। সেটাই এখন চেহারা পালটেছে।

যাই হোক—কিসের জন্য কি হয়েছে সে কথা থাক। যা হ'ল তাই বলি। সেদিন ওঁরা চলে গেলেন। আমার গৃহিণী খুব প্রীত হন নি। বেশী বিরক্ত হওয়া তাঁর উচিত ছিল মণি-বউদির উপর, কিন্তু তাও তিনি হলেন না। বেশী বিরক্তটা হলেন অমৃতদার উপর। বললেন

—কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। বিশ্রী। ছি। ওর থেকে ওর বউ অনেক ভালমানুষ। অহঙ্কার খুব আছে কিন্তু মিষ্টি।

ঠিক সাতদিন পর—গৃহিণী দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর পিত্রালয়ের আপনজনদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে আমাকে বললেন—অমৃতদা'র বাড়ী যদি যাবে তবে আমি দেশে চলে যাব। এখানে তুমি থেকো। যা ইচ্ছে হয় করো। এ তোমাকে বলে দিলাম আমি।

কথাটা কি? এ প্রশ্ন করবার সময়ই পেলাম না এবং প্রয়োজনও হল না; তিনি নিজেই বলে গেলেন। তবে সোজাসুজি ধারাবাহিকতার পথে নয়। আঁকাবাঁকা বিচিত্র পথে; আরম্ভ করলেন মণি-বউদির স্বরূপ বর্ণনা দিয়ে—।

সাংঘাতিক মেয়ে। একেবারে মায়াবিনী যাকে বলে। ঠিক তাই। ওই মণি-বউদি গো।

—মণি-বউদি? মানে?

—শোনই না মানেটা। ওপাড়ায় গিয়ে পা দেবা মাত্র সব একেবারে হৈচৈ করে ধরলে। কি রে, তোদের বাড়ীতে নাকি তোর অমৃতদা আর তার বউ গিয়েছিল? খুব নাকি গলায়-গলায় ভাব হয়ে গেছে তোদের সঙ্গে? তোর কত্তা নাকি ওদের বাড়ী যায়? বই দিয়েছে? ঘটা ক'রে নাম লিখে?

বললাম—হাঁ গিয়ে তো ছিল সেদিন। বউটি তো বেশ মানুষ—। অমৃতদা বরং—।

কথা আর শেষ করতে দিলে না। হাঁ—হাঁ করে বলে উঠল—সব্বোনাশ। বেশ মানুষ। ওই বউটা? ডেঞ্জারাস মেয়ে। আর অমৃতবাবুটা তো চোখ থাকতে কানা। বউয়ের রূপে চোখ ঝলসে গেছে। মরণ।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল তো?

—কেন বল তো কি? জান না কিছু? শোন নি কিছু?

—না তো। কি জানাশোনার কথা বলছ?

জানাশোনার কথা, অর্থাৎ যা তিনি জেনে ও শুনে এসেছেন তা হ'ল এই—এককালের দেশকর্মী অমৃতবাবু প্রৌঢ় পঞ্চান্ন বছর বয়সে ওই মাটির কল্যাণে অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হয়েছেন, সে ধনসম্পদ নানা শিল্পোদ্যমের মধ্যে নিয়োগ ক'রে শিল্পপতি হয়ে দাঁড়িয়েছেন; লীগ মিনিস্ট্রির মিনিস্টারদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে খ্যাতনামা হয়েছেন। তার উপর বিয়ে করেছেন মোহিনীমায়ার মত এই মেয়েটিকে। লোকে বলে, অমৃতবাবু ওকে নাকি টাকা দিয়ে কিনেছেন। আজ থেকে নয়—ছেলেবয়স থেকে ওকে পড়িয়েছেন, পাশ করিয়েছেন, তারপর রূপসী দেখে আর সামলাতে পারেন নি নিজেকে, মেয়েটাকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু মেয়েটা অমৃতবাবুর থেকে অনেক চতুরা, অনেক বেশী পটীয়সী, ছলনায় অনেক নিপুণা।

অমৃতবাবুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি—।

অমৃতবাবুর ওই যে ভাইপোটি, যার নাম কমলকুমার, যে শুধু বয়সে নবীনই নয়, নারীর চিত্ত ও চক্ষুকে রঞ্জন করার মত উত্তাপ এবং দীপ্তির অধিকারী, ওকে নাকি এই মণি-বউই বলে-

কয়ে চাকরি দিয়ে কাছে রাখিয়েছে।

শুধু তাই নয়—আরও আছে।

মণি-বউ নাকি কলকাতার পথে পথে পথচারিণীর মত ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্য নাকি—।

শুধু কি তাই?

মণি-বউ নিজে মেয়ে হয়েও মেয়ে-মহল পছন্দ করে না। পুরুষমহলেই সে তার ছন্দ খুঁজে পায়, মেয়েদের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকে; কথায় কথায় বলে—জানেন, ওই যে মেয়ে-পাঁচালী বলে একটা কথা আছে না? ওর বর্ণবিন্দু আমি বুঝিনে।

পুরুষমহলে কিন্তু পাঁচালী থেকে পঞ্চরঙ পর্যন্ত, পলিটিক্স থেকে ফ্রয়েড পর্যন্ত আলোচনায় তার এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

গৃহিণী বললেন—কি বলেছেন স্ত্রীকে, ওর নানান দুর্নাম। সে দুর্নামকে মণি-বউদি গ্রাহ্য করে না।

মণি-বউয়ের কলঙ্কে ভয় নেই। অন্তরালে লোকে ওকে কলঙ্কিনীও বলে। সেকথা শুনেও শোনে না।

ক'রের স্ত্রী বলেছে—তোর দাদা বলছিল—ওর সেটা ভালই লাগে। ওই একধারার মেয়ে ওরা।

গৃহিণী আমাকে বললেন—সকলে সাবধান করে দিলেন। বললেন—খবরদার, ওকে, 'মানে তোমাকে' ওর সঙ্গে মিশতে দিসনে। সম্পর্ক? এতদিন সম্পর্ক ছিল কোথায়? আজকালকার ফ্যাশন হল লেখক শিল্পী অভিনেতা আর্টিস্টদের সঙ্গে আলাপ করা। তারা ঘিরে বসে থাকবে আর মাঝখানে বসে খুকী আমার খুকীপনা করবেন। বলিস—ভেড়া বানিয়ে দেবে। এই তো নিজেই বলে গেছে—উনি? ওনার সঙ্গে আমাদের খুব মেলামেশা।

এর ক'দিন বা কিছুদিন পরেই। অর্থাৎ দু'চার দিন নয়, দশ বা পনের দিন পর। মণি-বউদির সঙ্গে সামনাসামনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম একদিন স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, একেবারে পথের উপর। কলকাতা শহরের রাজপথ, নইলে বলতাম পথের ঠিক মাঝখানে।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর—দুটো কি আড়াইটে বাজছে তখন। মনে পড়ছে একটা গল্প নিয়ে ছবি করবার কথা বলেছিলেন একজন। তাই নিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল একটি ছবির আপিসে। তখন ছবির আপিস বা ছবি করবার প্রতিষ্ঠান খুব কমই ছিল। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া কয়েকজন অবাঙালী প্রডিউসার কাজ করতেন। ডিরেক্টারদের মধ্যস্থতায় কাজ হ'ত। একজন ডিরেক্টারের অনুরোধে গিয়েছিলাম ছবির আপিসে। কাজ কিছু হয় নি; তবে হবে বলে একটা প্রত্যাশা আমার সেই কালের আশান্বিত মনকে আরও খানিকটা উজ্জ্বল করে তুলেছিল। বেশ হন হন করেই হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ফুটপাথের উপর বাগবাজার স্ট্রীটের সেই মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন। সেই তিনরঙা হাতি-পাল্লা পেড়ে তাঁতের শাড়ী খাঁটি বাঙালী মেয়ের ঢঙে পরা, কাঁধে সেই

শান্তিনিকেতনী ঝোলা ঝুলছে, সেই ঠিক মণি-বউদির মত দেখতে, সেই সামনের দাঁত দুটি ঈষৎ উঁচু, সেই মেয়েটি। হাতের ছাতাটি খুললেন সেই মুহূর্তে এবং মাথার উপর তুলে ধরলেন। মুখখানা ঢাকা পড়ে গেল। বুঝতে পারলাম না, ইচ্ছে করে ঢাকা দিলেন কিনা। তবে এটা বুঝলাম যে আজ তিনি পদযাত্রী নন ; দ্বিপ্রহরের জনবিরল ট্রামকার-বিহারিণী। ট্রাম থেকে নামলেন। আমার আজও মনে পড়ছে, ইচ্ছে হয়েছিল বাগবাজারের বাজারের সেই দেখতে-না-পাওয়া ছোকরার মত বলে উঠি—'দেখন-হাসি টুথপেস্ট।' ছোঁড়াটা যা বলেছিল তার থেকে 'দেখনহাসি' টুথপেস্ট অনেক লাগসই এবং মডার্ন। কিন্তু আজও মণি-বউদিকে এবং এই এঁকে ঠিক ত্রিভুজের মত মিলিয়ে এক করতে পারলাম না। চেহারায় এত মিল কিন্তু বেশভূষা চালচলনে এত প্রভেদ!

ইতিমধ্যে হনহন করে তিনি উত্তর দিক থেকে ধর্মতলা স্ট্রীট পার হয়ে উঠলেন দক্ষিণ দিকে, তারপর প্রায় আমার পাশ দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পূর্ব দিকের ফুটপাথে। একটু এগিয়ে গিয়ে একখানা রিক্সা ডেকে তার উপর উঠে পড়লেন। রিক্সাখানা চলতে লাগল। আমিও হঠাৎ প্রায় ঝোঁকের বশে, আর একখানা রিক্সা ডেকে তার উপর চড়ে বসে বললাম—ওই রিক্সার পিছনে পিছনে চল।

সে রিক্সাটা সুরেন ব্যানার্জী রোডে মোড় ফিরল।

আমার রিক্সাকে বলতে হল না। সেটাও ফিরল।

সামনের রিক্সাটা কিছুদূর এসে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মোড় ফিরল দক্ষিণ দিকে। রাণী রাসমণির বাড়ীর পাশের বাজারটাকে পিছনে ফেলে কিছু দূর এসে একখানা পুরানো কালের কোন বড়লোকের বাড়ীর দরজায় নামল। আমিও বললাম—রোখো। এবং আমিও রিক্সা থেকে নেমে পড়লাম। দেখলাম আমার দিকে তাকিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এবার দৃষ্টি দেখে সন্দেহ ঘুচল। হ্যাঁ—উনি মণি-বউদিই বটেন। চোখ দুটির দৃষ্টি কিছু উগ্র। কিছু কেন, বেশ উগ্র। তবুও আমি এগিয়ে গেলাম। এবং একটু হেসে বললাম—কি আশ্চর্য! আপনি? কি ব্যাপার বলুন তো?

তিনিও হাসলেন। আমার হাসিটা তাঁর মুখে গিয়ে আয়নার হাসির মত ফুটল কিনা জানি না, তবে সে হাসি যত ধারালো তত টান, ঠোঁট দুটো ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল, বললেন—আপনি এ রকম তা জানতুম না। ছি ছি ছি। ছি—। বলেই পিছনে ফিরে হন হন ক'রে গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছিল। কয়েক মিনিট পরেই ওটা যেন কেটে গেল এবং এবার যেন মাথার মধ্যে খুন চড়তে লাগল। ছি-ছি-ছি?—ছি?—কাকে? ওই কথা কয়টা ফিরিয়ে বলবার জন্য ইচ্ছে হল ঢুকে যাই ওই বাড়ীটার মধ্যে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট—পুরানো বড় বাড়ী ; একসঙ্গে অনেক কথা মনের মধ্যে ভিড় করে জেগে উঠল। আবার ভয়ও করল।

ঠিক এই সময়েই একটি ভদ্রজনবাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন—

নমস্কার। আপনি তো……। আপনাকে স্বামীজী ডাকছেন।

—স্বামীজী ?

—আমাদের গুরুদেব। আপনার বউদি হ'ন ওই মহিলাটি, মিসেস মুখার্জি আপনার কথা বলেছেন। তাই স্বামীজী বললেন—"ডাকো—ডাকো। বল একবার আসতে হবে। বল, উনি এলে আমি খুব খুশী হব।" আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। কিন্তু মনে হল চোর ধরতে এসে নিজেই চোর হয়েছি, শুধু তাই নয়—ধরা পড়ে গেলাম নিজের কাছে।

চার

সে দিন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ওই পুরনো বড়লোকের পুরনো আমলের বাড়ীর মধ্যে এক আশ্চর্য পুরনো পটভূমিতে দেখলাম অতি-আধুনিকা মণি-বউদিকে। অদ্ভুত লেগেছিল আমার। মস্ত বড় একখানা হলঘরে আসর হয়েছে, সেখানে এসে বসেছেন বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু মানুষ। সামনে একটি ছোট চৌকি বা ডায়াসের উপরে সযত্নরচিত সুখাসনের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন একজন স্বামীজী। স্বামীজী ঠিক নন। স্বামীজী বললে একালের একটা ঢঙ আসে। স্বামীজীও সন্ন্যাসী, গোসাঁইবাবাও সন্ন্যাসী, তবুও গোসাঁইবাবা যাঁরা, তাঁরা সেকেলে অর্থাৎ পুরনো কালের সন্ন্যাসী। স্বামীজীরা একালের, অর্থাৎ তাঁরা মডার্ণ। ইনি মডার্ণ নন, পুরনো কালের সেকেলে গোসাঁইবাবার মতই পোশাক-পরিচ্ছদ। পরনে গেরুয়া বহির্বাস, গলায় রুদ্রাক্ষ, ডান হাতে রুদ্রাক্ষের তাগাও ছিল, মাথায় ছিল রুক্ষ পাকা চুল, তাতে জটা না থাকলেও তাকে 'কেশভার' অনায়াসেই বলা চলে। এক মুখ পাকা দাড়ি গোঁফ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটি আশ্চর্য প্রসন্ন কোমল কান্তি ছিল সন্ন্যাসীটির সর্বাঙ্গে। এবং সে কান্তি তাঁর দেহের সুস্থ ও সবল বার্ধক্যের স্পর্শে যেন প্রসন্নতর হয়ে উঠেছিল। চোখ দু'টি ছিল বেশ বড় এবং তার দৃষ্টি ছিল শান্ত। সামনে ধূপকাঠি জ্বলছে, কিছু ফুল রয়েছে সামনে ; তাঁর সুখাসনের উপর এক পাশে সরানো রয়েছে। তাঁর অতি নিকটে একেবারে হাতের কাছে ছোট একটি চৌকির উপর ছোট কল্কেসহ গাঁজার সরঞ্জামও দেখতে পেলাম। এখানেই তিনি পুরনো।

ঘরখানি তখন লোকজনে ভরে ওঠে নি। অল্প-স্বল্প লোকই তখন এসে জমেছিল, একদিকে পুরুষেরা, অন্যদিকে মেয়েরা। মেয়েরা বলতে তখনও পাঁচ-ছ'জনের বেশী ছিলেন না। পুরুষেরা জন দশ-বারো হবেন।

বৃদ্ধ মানুষটি আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিলেন—দেখ না, দেখ না ; কপাল দেখ না। সংসার ছেড়ে পালালাম, মা বলে সর্বনাশী হারামজাদীর পিছু ধরলাম। প্রথম দিনকতক ভয় দেখালে। সে কত ভয়। বাপরে-বাপরে। তারপর দেখ না। দেখ না কাণ্ড, লেলিয়ে দিলে, লোক লেলিয়ে দিলে পিছনে। পালা বললে পালায় না, মারতে গেলে মার খায়, গাল দিলে মাখে না, এখন নে ঠ্যালা, নে। করি কি বল তো। কেন ? কেন আমার পিছনে

লেগেছে বল তো তোমরা, কেন ?

একটু থেমে আবার বলেই যান—

—আরে বাপরে। কেউ টাকা এনে বলে—নাও। কেউ দু হাতে পা জড়িয়ে ধরে বলে—ছাড়ব না। কেন রে বাপু, কেন ? ছাড়বি নে কেন ? যে নিজে সাঁতার জানে না, তাকে জড়িয়ে ধরে লাভটা কি ? তুই যদি বা বাঁচতিস তাও বাঁচবিনে ; ওই ওরই টানে তুইও ডুববি। কি করব ? নিরুপায়। আমি নিরুপায়। অগত্যা বলি—'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর' ?

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—না কি বাবা ? এঁ্যা ? এ ছাড়া এর মানে কি হয় ? এঁ্যা ? আমি বাবা নিজের পরিত্রাণই এখনও খুঁজে পাই নি, এদের কি করে ত্রাণ করি বল তো ?

এসবের একটা ধরাবাঁধা গৎ বা ছক আছে। জলের ধারা যেমন এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলে ঠিক সেই ধরনেই এই সংসারে বৈরাগী মানুষগুলি, যাঁরা হঠাৎ মধ্যপথে অন্য মানুষদের চোখে পড়েন বা ধরা পড়েন, তাঁরা এই এক ধরণের কথাই বলে যান। নদী নালার স্রোতের শব্দের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য এঁদের মধ্যেও আছে। কেউ চড়া সুরে গালি-গালাজ দিয়ে কথা বলেন, শাপ-শাপান্ত করেন, কেউ মিষ্টি কথা বলেন। এঁর দেখেছিলাম চেহারার সৌম্যপ্রসন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথাবার্তাটিও মিষ্টি। কিন্তু তাঁর কথার উত্তর কি দেব খুঁজে পেলাম না। আমার মন খুব প্রসন্ন ছিল না তাঁর উপর। কারণ তখনকার কালের আমি যে-আমি ছিলাম, সে-আমি এসব মানুষদের উপর কোন আস্থাই রাখতাম না। সব কিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ভণ্ডামি খুঁজে বেড়াতাম। কিন্তু সেদিন তাঁর কথাবার্তার জবাবে কি বলব তা ঠিক ঠাওর করতে পারি নি।

কারণ ছিল। এটি ছিল তাঁর নিজের এলাকা, বলতে গেলে এখানে তিনি রাজা-মহারাজার চেয়েও বড় হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। রামদাস স্বামী শিবাজীকে বলেছিলেন, 'তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি', এবং সে-ভিক্ষুক তিনি নিজে ; কিন্তু তিনি নিজে কার প্রতিনিধি তা না বললেও শিবাজীর কাছে তিনি ছিলেন বিধাতার প্রতিনিধি। সেদিন ওই কলকাতার ওই পুরনো কালের বংশধরদের কাছে তিনি ছিলেন তাই। তাঁকে অকারণে কটু কথা বলতে পারি নি। পারা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া জানতাম না, তিনি আমাকে কেন ডেকে-ছিলেন। তাঁর পাশে একদিকে মণি বউদি। বেশ একটু মুখ নামিয়েই যেন বসে আছেন। নিজের মনকেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম মণি-বউদি ফুটপাতে আমাকে যে ছি-ছি-কার দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, সে সব বিবরণ এখানে এসে নিবেদন করেছে নাকি ? সুতরাং উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবছিলাম, কি বলা উচিত, ওঁকে বিরূপ করে তোলা কি সমীচীন হবে ?

বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাব না। গেলে তার মধ্যে হয়তো ওই সন্ন্যাসীটির চরিত্র অধিকতর দীপ্তিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। এবং মণি-বউদি নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন। কিংবা আড়ালে পড়ে যাবেন। তবে এটুকু বলতেই হবে যে, সন্ন্যাসীটিকে আমার ভাল লেগেছিল শেষ পর্যন্ত। সে-

কালের সনাতন-পন্থী সন্ন্যাসী তিনি; তাঁর সংঘ নেই, তাঁর আশ্রম নেই; তাঁর লোকহিতকর কাজের কোন ফতোয়া নেই, সোজাসুজি তিনি বলেন, আমি মাকে ডাকি রে বাবা! আর কিছু না। মাকে দেখি নি রে, তবে সাড়া যেন পেয়েছি। তা তিনি যখন আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন তখন তোরা আমাকে ডাকলে সাড়া না দিয়ে কি করে থাকি বল? ভাগ্যটাগ্য ফিরিয়ে দিতে আমি পারি না বাবা, তবে মাকে বলতে পারি, মা, ওর ভাগ্যের মন্দটা তুই ভাল করে দে। সে সব পারে, তা পারে। তবে বাবা, কর্মটা তো তোর হাতে, যা তুই নিজে করিস তার ফলটা তো তোকে নিতে হবে। না হবে না? হুঁ হুঁ বাবা। ওখানে তো তো ছাড়ান নাই।

কে যেন বলেছিল—আপনি মাকে বলে মাফ করিয়ে দিন বাবা। এ তো প্রণাম মন্ত্রেই আছে 'অজ্ঞানদ্বা প্রমাদাৎবা বৈকল্যাৎ সাধনস্ত চ, যন্ন্যূনমতিরিক্তংবা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি'। তা তিনি করেন।

—ওরে বেটা। তুই তো দেখি খলিফা আদমী রে। এঁ্যা? পাপ করে বলবি, অজ্ঞানে করে ফেলেছি, প্রমাদের বশে করেছি, আপনি মাকে বলে ক্ষমা করিয়ে দিন। ভারী মজা রে। এঁ্যা। তুই নিজে বল না রে। নিজে বল। আমি কেন বলতে যাব রে। কি বাবা বল তো তুমি? ও বাবা, তুমি তো গুনি লিখেটিখে নাম করেছ গো। তোমার বই থিয়েটারে হয়। এ বেটাদের মত তো আমার কাছে পাপ মাফ করাতে আসো নি। এঁ্যা? বল না গো। এরা সব হতভাগা, বুঝেছ বাবা, একেবারে হতভাগা। মা তো সবারই মা। মাকে সরাসরি না বলে পাণ্ডা পুরুত দালাল এসব পাকড়ায় কেন বল তো?

এসব কথাবার্তা শুনলে মনে হবে এ তো সব বাঁধাবুলি। সনাতনপন্থী এইসব সন্ন্যাসীরা সেই বুদ্ধ শঙ্করের আগে থেকেই এই বুলি আউড়ে আসছেন। হয়তো এর সঙ্গে ছাই জটা এবং হাঁকডাকের আড়ম্বর কোথাও বেশী কোথাও বা কম এইমাত্র। আমি এই সন্ন্যাসীটিকে ভাল বা মন্দ কোন একটি নির্দিষ্ট বিশেষণে চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে মণি-বউদির কোন অভিযোগে তিনি আমাকে তিরস্কার করবেন এ ভয়টা তখন গেছে। এর মধ্যে কয়েকবার চলে আসতেও চেয়েছিলাম, কিন্তু, তিনি বলেছিলেন—বসো বসো, একটু বসো। আমার একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। একটু আলাদা বলব।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা আবার একবার ধড়াস করে চমকে উঠেছিল। সে চমকটা প্রচণ্ডরূপে প্রবল হয়ে উঠল, যখন তিনি সান্ধ্য উপাসনার সময় আমাকে অন্য ঘরে ডেকে পাঠালেন তখন। উপাসনার জন্যে তিনি অন্য ঘরে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন মণি-বউদি। আর একজন মহিলাও গেলেন। দু-চারজন ভক্তও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর একজন এসে আমাকে ডাকলেন।

—বাবা একবার ডাকছেন আপনাকে।

—আমাকে! চমকে উঠেছিলাম আমি।

—হ্যাঁ আপনাকে। আপনার উপর বাবার অসীম দয়া।

বেশ নার্ভাস হয়েই ঘরের মধ্যে গেলাম। যাবামাত্র বাবা বা সন্ন্যাসী সকলকে বললেন—বাইরে যাও তো সকলে। একবার বাইরে যাও। মা তুমি থাক। মণি মা।

আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অনুমান করতে পারছিলাম না, মণি বউদি কি অভিযোগ করেছেন এই সন্ন্যাসীর কাছে। তবু কোন রকমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম। সকলে চলে যেতেই সন্ন্যাসী বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা, মণি মা তো তোমার বড় শালার স্ত্রী। তা ওকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি। আমার টাকা-কড়ির কি দরকার? নিয়ে আমি কি করব? কিন্তু উনি ছাড়বেন না। কিছুতে ছাড়বেন না। পাঁচ-দশ, দুশো-চারশো হয়, তা নিয়ে না হয় পাঁচটা গরীবকে দিই, কল্যাণ যেটা সেটা ওঁকেই অর্শাক। কিন্তু পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা, এ নিয়ে কি করব বাবা? আমি বলছি—মা, তুমি নিজে টাকাটা দিয়ে কোন সৎ কার্য কর। দান-ধর্ম কর। কিন্তু না। উনি ধরেছেন আমাকে দেবেন।

শুনে আমি অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। সন্ন্যাসীর মুখে দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে মানুষটির মুখের সেই সৌম্য প্রসন্নতা আমার মনে একটি অকপট ও অকৃত্রিম রূপের আভাস ফেলে দীপ্ত করে তুলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি আশ্চর্য মিষ্ট রসের আস্বাদনেও তৃপ্ত করেছিল। দেখবার যা-কিছু ছিল মণি বউদির মুখে। সে যে কি ছিল তা বলে বা বর্ণনা করে বুঝাতে পারব না। তবে ছিল, আশ্চর্য কিছু ছিল। বিস্ময়কর কিছু ছিল। যা কখনও দেখি নি মণি বউদির মুখে। আশ্চর্য সে মুখ। আবেগে আরক্তিম এবং দু চোখে বইছিল জলের ধারা। এমন নীরব নিবেদন আমি আর দেখি নি। হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

কথাটা এইখানেই থাক। মোট কথাটা বলে নি। মোট কথা হল এই যে, সন্ন্যাসীটি মণি-বউদির টাকা নেন নি। অন্তত সেদিন নেন নি। এবং আমাকেই বলেছিলেন, মণি-বউদিকে সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দিতে। বলেছিলেন—এ পাড়াটা তো নানান জাতের পাড়া। তা ছাড়া এ সময়টাও ভাল নয়।

একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরেছিলাম। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, সেটা ১৯৪২ সাল। তখন মধ্য কলকাতায় চৌরঙ্গী এবং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট এলাকা যুদ্ধের বাজারে একটি বীভৎস চেহারা নিতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে নিয়ে ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার সাহস হয় নি, শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর কথাই ভাবছিলাম আর মধ্যে মধ্যে চকিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে নিচ্ছিলাম। দেখে নিচ্ছিলাম কথা ঠিক নয়, দেখছিলাম। বোধ হয় তাঁর মুখ দেখে তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। বউদির চোখের জল তখনও ঠিক শুকোয় নি। স্থিরভাবে, প্রায় যেন পুতুলের মত সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে ছিলেন। তাঁর মাথার ঘোমটা খানিকটা স'রে ন'ড়ে গিয়েছিল, তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমি ভাবছিলাম।

তিনিই প্রথম কথা বলেছিলেন—আমি নই। কফি হাউস পার হয়ে এসে তিনি বলেছিলেন—আপনাকে একটা কথা বলব।

—বলুন।

—যা বলব, তা শুনবেন ?

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম—আগে শুনি।

—এ কথা কাউকে বলবেন না।

এতে আমার আপত্তি হবার কারণ খুঁজে পাই নি। বলেছিলাম—বলব না।

বেশ মনে পড়ছে, গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে মোটরের ইঞ্জিনের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ-গুঞ্জিত বাতাবরণের মধ্যে আমাদের মৃদু স্বরের টুকরো-টুকরো কথাগুলি যেন পুকুরের জলে, পাড় থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ঢিলের মত মধ্যে মধ্যে টুপ-টুপ শব্দ তুলে ডুবে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ওই 'বলব না' কথাটি। আমার মনে হয়েছিল যেন আমার খুব কাছেই একেবারে পুকুরের কিনারার জলে, কথাটি ছোট একটি ঢিলের মত পড়ে ডুবে গেল। এবং এর মধ্যে কোথায় যেন কি একটা কিছু আছে, যা উদাসীন, যা বিষণ্ণ ও একান্তভাবে আধ্যাত্মিক বা রহস্যময়।

তার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা।

গাড়ীটা এসে ট্রাফিক কনেস্টবলের হাতের ঠেকায় আটকে থমকে দাঁড়িয়েছিল হ্যারিসন রোড এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংশনে।

এবার ইঞ্জিনের শব্দও ছিল না। গাড়ীর ভিতরের অন্ধকার এবার বোবা। সেই বোবা অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম, তিনি ঠিক সেইভাবে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। এক সময় একটা সশব্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। শব্দটাই বলে দিলে, এই দীর্ঘনিঃশ্বাসটি মণি-বউদির বুকের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ আমি বললাম—বউদি, আপনি চলে যান, আমি এইখানে নামি।

চমকে উঠলেন—নামবেন ? কেন ?

—এই তো নাট্যভারতী। ওই তো কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোড জংশন।

—জানি। কিন্তু আজ তো থিয়েটার নেই। গিয়ে কি করবেন ?

উত্তর দিতে পারলাম না। বলতে পারলাম না যে, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। বউদিই বলে উঠলেন—আজকে তখন ফুটপাথের উপর কিন্তু আমিআপনাকে অন্যায় কথা বলেছি। কিছু মনে করবেন না যেন। এঁ্যা—! এমন হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন আপনি। চমকে উঠেছিলাম।

কথাটার উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে অন্য কথায় এলাম, বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করব বউদি ?

—কি বলুন ?

—ওঁকে টাকাটা দিতে চাচ্ছিলেন কেন ?

—কেন ? বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ইচ্ছে হচ্ছিল বললেই সত্যি বলা হবে। কিন্তু আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন ?

—না; তা করব না। আপনি নিজেই করছেন না। করলে নিজেই বলে নিজেই

সংশয় প্রকাশ করতেন না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হ্যাঁ তা ঠিক বলেছেন। নিজেই সংশয় প্রকাশ করতাম না।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখুন, ক দিনই ওঁর কাছে আসছি। এসে-এসে কেমন ধারণা হয়ে গেছে যে, টাকাটা উনি নিলে আমার ভাল হবে।

বলে ফেললাম—আপনার ভালোর অভাবটা কি বলতে—। মাঝপথে থেমে গেলাম। মনে পড়ে গেল বউদি নিঃসন্তান।

বললাম—ওতে কি ফল হয় বউদি? আপনি ডাক্তার-টাক্তার নিশ্চয় দেখিয়েছেন—তাঁরা কি বললেন? এ ভাবে ছুটে—

—ডাক্তার কিসের জন্যে? তারপরই বললেন—ও। বুঝেছি। না, ভাই, আপনি আমার নন্দাই—আপনাকে লজ্জাও নেই, গোপনও করব না; ছেলেপুলে আমার হবে না। আর ও নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই।

—তা হ'লে কোন্ ভালোটার আপনার অভাব বলুন তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—তা জানিনে ভাই। কিন্তু মনের মধ্যে কি একটা নিদারুণ অভাব অশান্তি আমার আছে তা বলতে পারব না। উনি যখন থাকেন তখন নানান ভাবে মেতে থাকি, উনি বলেন আমি মাতিয়ে রাখি, আমি বলি উনি মাতিয়ে রাখেন। যাই হোক যিনিই রাখুন মাতিয়ে, মেতে থাকি। কিন্তু একলা হলেই মনে হয় সব মিথ্যে। সব ফাঁকি। সব শূন্য। বাড়ীঘর কাপড় গয়না টাকা সব তেতো হয়ে যায়। আমার কোষ্ঠীতে এখন খুব খারাপ দশা চলছে। খুব খারাপ দশা।

অবাক হয়ে গেলাম। অতি মডার্ণ মণি-বউদি সন্ন্যাসীকে পাঁচ হাজার টাকা দান করতে চেয়েছিলেন, সে তথ্য বা সত্যকে হজম করেছিলাম কোন রকমে, কিন্তু মণি-বউদির খারাপ দশা চলছে কোষ্ঠীতে, এই কথাটাকে বিশ্বাস করে নিজের মনের মধ্যে নিজেই আগুন জেলে বসে আছেন এটা হজম করতে পারলাম না।

বউদি বললেন—আমার ভাগ্যই খারাপ। জানেন, একবার ওই ছেলের জন্যই অশান্তি কথাটা বিশ্বাস করে, একটি ছেলেকে নিয়েছিলাম, মানুষ করব, লেখাপড়া শেখাব—এইরকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে এমন প্রব্লেম হয়ে দাঁড়াল যে হে ঈশ্বর রক্ষা কর বলে বেশ কিছু খেসারত দিয়ে সে ছেলে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখনও মাস-মাস কিছু ক'রে খরচ গুনতে হয়।

আবার খানিকটা চুপ ক'রে যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—কত বড় বড় জ্যোতিষীর কাছে গেছি, কতজনকে হাত দেখিয়েছি, কত সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গেলাম, কত দেবতাস্থানে প্রণাম করলাম—কিন্তু মনের এই খালি খালি ভাব, এই একটা অশান্তি—এ আর আমার গেল না। বুঝছেন, উনি আপিস চলে যান, আমি বেরিয়ে যাই। ঘুরি—। কোন মন্দিরে নয়তো কোন সাধুর কাছে গিয়ে বলি, বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি। আবার

উনি যখন কলকাতার বাইরে যান তখন তো আমার নিরঙ্কুশ অবকাশ। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে যায়। আটটা ন'টাও বেজে যায়। এই তো দু'দিন থেকে তিনি বাড়ী নেই। দিল্লী গেছেন। কাল ফিরতে হয়েছিল রাত্রি ন'টা। এই বাইরে বাইরে আমি বেশ থাকি। পায়ে হেঁটে ঘুরি। গঙ্গার ঘাটে বসে পাঠ শুনি। বেশ লাগে।

আমি বলে ফেললাম—আমি জানি।

সচকিতের মত আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—জানেন? কে বললে? ওরা বুঝি?

ওরা মানে আমাদের অন্য আত্মীয়-স্বজন। তাঁদের সঙ্গে অমৃতদা মণি-বউদির তৈল-বার্তাকুর মত সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। আমি, 'জানি' বলবামাত্র মণি-বউদি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছেন কথাটা আমি তাঁদের কাছে থেকেই জেনেছি। একটু হাসি আমার এসেছিল। কিন্তু সে হাসি নিজে জাহির করতে পারি নি। আমার মধ্যের পুলিশটা তখন একটা কুটিল বা ক্রুর ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি তেমনি একটি ভঙ্গিতেই তাঁকে বললাম—বাগবাজারের ঘাটে আপনাকে দেখেছি। পাঠ শুনছিলেন। সেদিন এমনি তিনরঙা হাতী-পাজা পেড়ে শাড়ী পরেছিলেন। আর একদিন—।

একটু থেমে বললাম—এইদিনই আপনাকে প্রথম দেখেছিলুম গৌড়ীয় মঠের রাস্তাটা ধরে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। বাজারের সামনে একটা ছেলে—।

মুখে আটকে গেল কথাটা।

বউদি এবারে হেসে উঠলেন খিলখিল ক'রে। বড় দাঁত দুটি বেরিয়ে পড়ল একটু বেশী করে। আঁচল চাপা দিয়ে বউদি দাঁতের লজ্জাটা ঢাকা দিলেন। হাসিটা একটু সামলে নিয়ে বললেন—ওমা। আপনি সেই দন্তরঞ্জন মনোমোহিনী টুথ পেস্ট শুনেছেন বুঝি—কি বলব আপনাকে? ছোঁড়াটা এই সবে পনের ষোল বছরের একটা ইতর। আগে বাগবাজার আমি প্রায় যেতাম। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ওদিকটা মাড়াইনে, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে।

তারপর বললেন—কতজন যে কত বলে ঠাকুর জামাই। আর আমি যে কোথায় কিভাবে কাকে কটু কথা বলি আর কার কথা হেসে উড়িয়ে দিই তা কি আমারই মনে থাকে? এই আজ যেমন আপনাকে—!—কিছু মনে করবেন না যেন। কেমন?

গাড়ীটা ইতিমধ্যে তখন তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে গেছে। বউদি বললেন—রোখো ড্রাইভার। এ হি মোকাম। রোখো।

মণি-বউদি তখন সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছেন। গাড়ী থেকে নামতে হঠাৎ যেন তাঁর মনে পড়ে গেল কথাটা। অন্ততঃ বলবার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হল। গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে চেঞ্জ নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, ওরা কি বলছে বলুন তো? ওরা—। যা তা বলে নি আমার নামে? বলে না?

পাঁচ

সেদিন মণি-বউদির বাড়ী থেকে ফিরতে কিছু রাত্রি হয়েছিল। সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। মণি-বউদি সেদিন যে-বিচিত্র রূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চুম্বক এবং আমি হয়ে উঠেছিলাম লোহা।

গোটা বাড়ীটা সেদিন নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল এবং তাই-ই ছিল। বাড়ীতে কেউ ছিল না। কারণ অমৃতদা দিল্লী গেছেন। দরজাতে লেখা আছে এ এল মুকুরজী—আউট, মিসেস মুকুরজী—আউট। এছাড়াও একটা ছোট কার্ডজাতীয় কাগজে লেখা আছে 'টু ডেল্‌হি'।

মিস্টারের সঙ্গে মিসেস বাইরে যান—এইটেই তাদের নিয়ম বলে সকলে জানলেও মিসেস মুকুরজী সব সময় যান না। কিন্তু ওই রকম লেখা থাকে। কমলকুমারও নেই। সে তার কাকার সঙ্গে গেছে।

বউদি ভিতরদিকের একটি ঘরে আমাকে বসিয়ে বলেছিলেন, বসুন—চা করতে বলি—খাবার আনি।

চা নয়, কফি খেয়েছিলাম। মণি-বউদি কফির পট নিয়ে বসে ছিলেন। বেশ বড় পট, আমাকে প্রায় আড়াই কাপ খাইয়েছিলেন। নিজে দেড় কাপ।

অন্তরঙ্গতার জন্ম হয় জীবনে-জীবনে কাছে আসার মধ্যে। আড়াল নেই, বাধাবন্ধ নেই এমন যেখানে মিল বা কাছে আসা—সেখানেই অন্তরঙ্গতা বর্ষার বীজের মত উপ্ত হয়—পাতা মেলে ডালপালা মেলে, ফুল ধরায়, ফল হয়। তবে তাতেও একটা সময়ের প্রয়োজন হয়, প্রকৃতির তাই বিধান। কিন্তু এমন বাজীকরও আছে, যে এখনি আমের আঁটি পুতে, একটু জল দিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জাদুবৃক্ষকে বড় ক'রে বাড়িয়েই তোলে না—তাতে ফল ধরায় এবং সে ফল দর্শকদের নাকি আস্বাদনও করায়। আমি এমন আম কখনও আস্বাদন করিনি কিন্তু সেদিন আমাদের অন্তরঙ্গতার যে বীজটি কিছুদিন আগে পুঁতেছিলাম, সেদিন সেটি জাদু-বৃক্ষের বা লতার মতই বেড়ে উঠল এবং অজস্র ফুল ফুটিয়ে তার সর্বাঙ্গ পুষ্পিত করে তুলল।

সে দিন দুজনে আমরা সেই বাজীকরের বিধানের আওতায় এসে পড়েছিলাম। ওই যে গাড়ীতে অর্থাৎ ট্যাক্সিতে দুজনে এসেছি, সেই সময় যদিও দুজনে খানিকটা আড়ষ্টভাবে যথা-সম্ভব স্বল্প কথা করেছি এবং সে-কথাগুলোও নেহাৎ ফৌজদারী আদালতের জেরাধর্মী প্রশ্নোত্তরের মত, তবুও তারই মধ্যে কোন্ জাদু ছিল জানি না—আমরা ওই বাজীকরের ভেল্‌কির মধ্যে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় হয়ে উঠেছিলাম।

ওই জাদু বা ভেল্‌কি কোন কথার মধ্যে লুকনো ছিল তা বেশ অনুমান করতে পারি। ওই যে—যে-মুহূর্তে আমি বলেছিলাম—আমি জানি—আমি দেখেছি আপনাকে বাগবাজার স্ট্রীটে; বাগবাজারের বাজারে; সেই যে কে এক চ্যাংড়া ছোঁড়ার 'ঐ-ই যায়—দন্তমনোরঞ্জিনী সুহাসিনী টুথ পেস্ট' হাঁকটির কথা, সেই মুহূর্তে পরস্পরের কাছে দুই চোরের মত মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র জাদুর মায়ায় পরস্পরের নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম।

মণি-বউদির কিন্তু এতে কোন লজ্জার হেতু ছিল না। বড় জোর কোন মডার্ণ বড়লোক বন্ধুর কাছে কথাটা প্রকাশ পেলে একটা লজ্জার হেতু আছে—সেটা হল কোষ্ঠীমানা দেবতা-মানা ধর্ম মানার জন্যে লজ্জা, কিন্তু সেটা আর এমন কি? লক্ষ্মীর ঘর, একটু আড়ালে—পুজোর ঠাঁই, এ শতকরা নিরেনব্বুইয়ের আজও আছে। কোষ্ঠীও। যাক—মোট কথা মণি-বউদির এতে লজ্জার হেতু বা চুরি করার দায়ের মত কোন দায় ছিল না। আমার বরং ছিল, অন্ততঃ ওই যে ছোঁড়াটার সুহাসিনী টুথ পেস্ট হাঁক শুনে উনি হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন—সেই সুহাসিনীর মুখ দেখবার জন্য যে একটি অশোভন আগ্রহ আমি দেখিয়েছিলাম তার জন্য লজ্জা আমাকে স্পর্শ করা উচিত ছিল। কিন্তু মণি-বউদি যখন ট্যাক্সি বিদায় করে আমাকে বসিয়ে—কফির পট এবং জল-খাবারের ডিস নিয়ে এসে সামনে বসলেন তখন কোন লজ্জারই কোনদিক থেকে লম্বা ঘাড় বাড়িয়ে আমাদের মধ্যবর্তী স্থলটুকুর মধ্যে মুখ দেখাবার কোন সুযোগই হয় নি—বা তেমন স্থানটুকুও ছিল না। আমরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম।

কথায় কথায় সেদিন সন্ধ্যায় মণি-বউদি তাঁর সমস্ত অন্তরটাই আমার কাছে খুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—জানেন ভাই, জীবনটা আমার আশ্চর্য। একলা থাকলে কথাগুলো মনে পড়ে। ভাবি আর নিজেই যেন কূলকিনারা হারিয়ে ফেলি। হাঁপিয়ে উঠি। বুঝতেই পারি না কেন আমি এই লোকটিকে বিয়ে করলাম। কেন আমি—এমন—।

চুপ ক'রে গিয়েছিলেন মণি-বউদি। যেন ওই 'কেন' প্রশ্নটির উত্তর কি—সহস্রবার ভেবে পাননি, একাধিক সহস্রবারের জন্য তাই আবার ভেবে দেখলেন।

তারপর আবার হঠাৎ মুখ খুললেন—জানেন—ওঁকে আমি একজনের কাছ থেকে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছি? আর তিনি যে-সে নন—তিনি ওঁর প্রথম যৌবনের ভালবাসার জন। এবং—।

একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন—এবং তিনি আমার মাসীমা হতেন। আপন মাসীমা। ওঃ—সে যুদ্ধ একটা ভীষণ যুদ্ধ। নুটুকে নিয়ে বিমলা আর কল্যাণীর যুদ্ধ আর কি—কতটুকু? কল্যাণী তো আপনার মরা মানে বিদেহিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী। হিন্দুর ঘরের বিধবাকে টেনে এনেছেন—এর থেকে আর তাকে কতটুকু প্রজ্বলিতা দেখাতে পারতেন?

আমার মনে পড়ছে—'বিদেহিনী, এবং 'প্রজ্বলিতা' শব্দদুটি—মণি-বউদির মুখে শোনা শব্দ। শব্দদুটি শুনে পঁচিশ বছর আগে ১৯৪২ সালে চমকে গিয়েছিলাম; গিয়েছিলাম বলে মনে আছে শব্দ দুটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়েছিল যে, শব্দদুটি মণি-বউদির যোগ্যই হয়েছে। কারণ—মণি-বউদি সে আমলের বি-এ পাশ। এবং কিছুকাল মাস্টারীও করেছিলেন বিয়ের আগে। এই বাড়ীতে যেদিন প্রথম এসেছিলাম ওঁর আমন্ত্রণে, সেদিন মণি-বউদি নাটক নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তাতে এ শব্দদুটো আমার কাছে একটু অভিনব প্রয়োগ বলে মনে হয়েছিল এবং মনে মনে তারিফ করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে অসঙ্কোচেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—মনে হয়েছিল তাঁর মনের-মহলের

খোলা জানালা দিয়ে—মহলের ভিতরের বিদ্যা ও বুদ্ধির মণি-দীপের আলোর ঝলকানি যেন বেরিয়ে এসে আমার চোখের উপর টর্চের ছটার মত পড়ছে।

* * * *

বলতে বলতে মণি-বউদি তাঁর নিজের কথা প্রায় সবটাই বলে ফেলেছিলেন সেদিন।

মণি-বউদির বাপ ছিলেন সে আমলের 'রেবেল' অর্থাৎ বিদ্রোহী। নাম ছিল গোপীজনবল্লভ চাটুজ্জে কিন্তু প্রকৃতিতে ছিলেন ত্রিশূলধর রুদ্র। ১৯১৬ সালের ওধারের কথা। সুতরাং অনায়াসে বিনা ডিটেল্‌সেই বিশ্বাস করতে এতটুকু বাধা হয়নি যে, মণি-বউদির বাবা একটি গোঁড়া হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে সে-আমলের একটি প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়েটা কিন্তু হয়েছিল হিন্দুমতে। কারণ মণি-বউদির বাপের প্রথমা স্ত্রী ওদিকে বাড়ীতে বাড়ী দখল ক'রে বসে ছিলেন। এবং তা অগোচর ছিল না মণি-বউদির মার কাছে। সুতরাং রেজিস্ট্রী করে বিয়ের উপায় ছিল না। তার জন্য এ-বিয়ের ফলে পাত্র কন্যা উভয়কেই উভয়ের পিতৃপক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।

মণি-বউদির বাবা ছিলেন গোঁয়ার মানুষ। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে অকূলে ভাসার মত—বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বেহার অঞ্চলে। বেহারশরিফের কাছাকাছি একখানা গ্রাম—সে গ্রামে বুন্দেলা রাজপুতদের বাস এবং তাদের কুলপতি হিসেবে একঘর জমিদার তাঁদের দৌলতখানা গড়ে তুলেছেন। সেই গ্রামে এসে সাঁতার জল থেকে একহাঁটু জল পেয়ে—ডাঙ্গায় উঠলেন এবং প্র্যাক্‌টিসের জন্য চেপে বসলেন।

মণি-বউদির সে গল্প আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—সে আমলটাই অন্যরকম ছিল—মানুষগুলোও আলাদা ধরণের ছিল। বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের বয়স হয়েছিল নাকি সত্তর বছর—সেই বয়সে হয়েছিল অসুখ। ওঁদের ছিল কবিরাজ আর হাকিম। তারা খাওয়ার ধরা-কাটা করেছিল বলে ডাক্তার আনবার হুকুম হয়েছিল। আমার বাবা প্রথম কিছুদিন 'রাঢ়'-এ ছিলেন। রাঢ় থেকে বক্তিয়ারপুর, সেখান থেকে বিহারশরীফে এসে মাস দুতিন বসেছেন—এই সময় এল এক ডাক। গেলেন দেখতে। গিয়ে বিছানার পাশে বসলেন—তা ঠাকুরসাহেব হুকুম করলেন—শোন হে ডকডর সাব,—তুমি তো দেখি নেহাৎ ছোকরা হে! চিকিৎসার কিছু জান? শোন—আমাকে সারাতে হবে। এ বেটারা বুড়বকের দল, বলছে উপোস করতে হবে। আরে বাবা ভুখাকে মারে তো ভূত-পিরেত ভি ভাগতা হ্যায়—এ তো বেমার আর বুখার। খেতে না পেলে তো আপনি সারবে। হাকিম কবরেজ ডাকডরে কি জরুরৎ। আমি খাব। তুমি ওষুধ দাও। দিয়ে সারাও, তবে তো তুমি ডাগডর।

ঠাকুরসাহেব খেতেন ঘি রাবড়ি, মিঠাই, হালুয়া, আর সে-সব ব্যঞ্জনের ফিরিস্তি কি দেব? ওদের ঠাকুরবাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখেছি—সত্যি সত্যি এক-অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একুনে একান্ন পদ ছাড়া ওদের ভোজনের পর্ব শেষ হয় না। তা সেই খাওয়া তিনি খাবেন আর তাঁকে সারিয়ে তুলতে হবে ডগডর সাহেবকে। সারিয়ে দিলে বহুৎ ইনাম শিরোপা মিলবে।

না-সারলে ডগডরের জান থাকবে ঠাকুরসাহেবের জিম্মাদারীতে।

বাবা বলতেন—হয়েছিল আমাশয়। শেষ কি করবেন—ভেবে চিন্তে বললেন—হ্যাঁ খেতে আমি নিশ্চয় দেব—কিন্তু ওই ধরণের খাওয়া নয়—ঠাকুরসাহেবকে শিকারের পাখীর গোস্ত খেতে হবে। টাটকা, হোয়াইট মীট। আর মাংসে আমাশয় সারায়।

মণি-বউদি হঠাৎ খুব হেসে উঠেছিলেন।

আমি একটু চমকে উঠেছিলাম।

মণি-বউদি বলেছিলেন—রোজ ক'টা পাখীর মাংস খেতেন জানেন? বালিহাঁস জানেন তো? সেই বালিহাঁস—মিনিমাম আটটা দশটা। খেতে খেতে আপসোস ক'রে বলতেন, একি খাব ডাগডর সাব, আমি যে আমি বুঢ্যা আদমী—আমার দাঁতে তোড়নে কো লায়েক এক হাড্ডি নেহি ইসমে।

যাই হোক—মণি-বউদির বাবার ভাগ্য ভাল, ঠাকুরসাহেবের সে অসুখ দিন-তিনের মধ্যে সেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরসাহেব বললেন—ডাগডর ভাই, তুমি হামারা হিঁয়া আ যাও ভাই। এখানে লোকদের চিকিৎসা কর। আচ্ছা ডগডর তুমি।

এক কোঠী অর্থাৎ ইটের দেওয়াল—খাপরার চাল বাড়ী, অন্দরটা দোতলা, আর সামনের বাহার মহলটা একতলা, চৌকা 'থাম'ওয়ালা অংশটা ডগডরখানা, এর উপর মাসে দু মণ মিহি চাল—এক মণ ঘরে-পেশাই আটা, আর পঞ্চাশ রুপেয়া নগদ, এই বরাদ্দ হল—ঠাকুরসাহেবের কাছাহ্‌রী থেকে।

এছাড়া একটা ছোটখাটো দাওয়াইখানা রইল।

এসবের পরিবর্তে ডগডর সাহেব ঠাকুরসাহেবের বাড়ীর বাঁধা ডাক্তার হলেন। ঠাকুরসাহেব থেকে চাকরবাকর সকলকে দেখতে হবে।

এরপর মণি-বউদির বাপের প্র্যাক্‌টিস্ জমে উঠতে দেরি হয়নি। মাসকয়েকের মধ্যেই পদাতিক ডাক্তারবাবু—শুধু অশ্বারোহী পদেই উন্নীত হন নি—বাইসাইকেলারোহী হয়েও পাকা শড়কে কাপড় ও কোটের সঙ্গে শোলাহ্যাট মাথায় দিয়ে রথবাজীসমন্বিত ভাগ্যবানে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন।

এইখানেই হয়েছিল মণি-বউদির জন্ম। বছর তিনেক পর—১৯১৪ সালে।

এর বছর দুয়েক পর মণি-বউদির মা মারা গেলেন। মণি-বউদির বাবা আর বিয়ে করলেন না; ঠাকুরসাহেব তখনও বেঁচে—তিনিই মেয়েটিকে মানুষ করতে এবং ডগডর সাহেবের যত্নআত্তি করতে দেখে দিলেন এক যুবতী দাসী। নাম ছিল তার 'সরবতিয়া'। জাতে কি ছিল তা জানেন না মণি-বউদি। জাত তার ছিল না, থাকলে সে ছিল জাতেই ঝি।

মণি-বউদি বলেছিলেন, খুব বেশী খুলে তো বলার দরকার নেই। বুঝতেই তো পারেন। তবে যেটা বুঝতে পারবেন না সেটা বলে দি। সেটা হ'ল এই যে, মেয়েটা ছিল ঠাকুরসাহেবের বাড়ীর কেনাদাসীর পেটের মেয়ে। লোকে বলত সরবতিয়ার দেহে ছিল ঠাকুরসাহেবদের বংশের রক্ত।

সরবতিয়া খুব সম্ভ্রমের এবং তরিবতের মেয়ে ছিল। তার সহবৎ ছিল কুলবধুর মত। সরবতিয়ার বিয়ে একটা দিয়েছিলেন ঠাকুরসাহেব কিন্তু সরবতিয়া বছর কয়েকের মধ্যেই পূর্ণযৌবনকে বুকে ধরে বিধবা হয়ে ফিরে এল। মেয়েটার একটা ছেলে হয়েছিল, সেটা গেল কিছুদিন পর। সাগাইয়ের কথা ভাবছিলেন ঠাকুরসাহেব। ওদিকে বাড়ীর ছেলেপিলেরা সরবতিয়ার উপর ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় ঘটল ঘটনাটা। ঠাকুরসাহেব ডগডর সাহেবের হাতে সরবতিয়াকে দিয়ে বলেছিলেন—ডাগডর, সাদী যখন করবে—করবে—এখন একে নিয়ে যাও—তোমার মেয়েকে দেখবে তোমাকে দেখবে। মেয়েটারও ছেলে মরেছে—ও তোমার মেয়েটাকে পেয়ে খুশী হবে।

মণি-বউদির বাবা তখন পত্নীশোকে প্রায় সতীহারা শিবের মত হয়ে উঠেছেন। মণি-বউদির মা মারা গিয়েছিলেন হঠাৎ। হার্টফেল করেছিলেন। মণি-বউদির বাবা শেষসময়ে বাড়ী ছিলেন না। ডাকে বেরিয়েছিলেন রোগী দেখতে। এর ধাক্কাটা তিনি সামলাতে পারেন নি। মদ ধরলেন সেই দিনই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেই হয়।

মণি-বউদির বয়স ছিল তখন বছর দুয়েক। এসব তাঁর মনে নেই, শুনেছিলেন। শুনেছিলেন ওই সরবতিয়ার কাছে। ডাগডরবাবুর বউ মরে গেছে খবরটা নিয়ে বুড়ী দাঈটা ছুটে গিয়েছিল ঠাকুরসাহেবের বাড়ী। ঠাকুরসাহেব নিজে এসে বসেছিলেন। এদিকে মণি-বউদি, তখন ছোট দু বছরের মণিমালা, মায়ের সাড়া না পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ঠাকুরসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন—যা সরবতিয়াকে ডেকে আন। বিধবা সরবতিয়ার ছেলেও মরেছে—কচি ছেলে—তার বুকে দু'ধ আছে—দু'ধ দিয়ে ডাগডরের মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করুক।

মণি-বউদির বাপ ফিরে এসে মরা স্ত্রীকে দেখে কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়েই থাকলেন। একবার শুধু নেড়েচেড়ে দেখে উঠে গিয়ে বসলেন তাঁর রোগী দেখবার ঘরে। ঠাকুরসাহেব যে ঠাকুরসাহেব, তাঁর ডাকেও সাড়া দেননি।

শ্মশানে গেলেন—মুখাগ্নি করলেন। শব-সৎকার করে ঘরে এলেন—স্তম্ভিত বাক্যহারা এক মানুষের মত। তখনও পর্যন্ত ঠিক রইলেন। তারপর একসময় রাত্রে ডিসপেনসারির আলমারি থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলে শুরু করেছিলেন মদ্যপান। মদ খাওয়ার একটা অভ্যাস তাঁর ছিল—সেটা ছিল পরিমাণে পরিমিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত। রাত্রে খাবার সময় এক পেগ ক'রে ব্র্যাণ্ডি তিনি খেতেন। সেদিন থেকে পরিমাপ এবং নিয়ম এ দুটো উঠে গেল।

মাসখানেক পর আবার সবই যথানিয়মে চলতে লাগল—সব মানে ডাক্তারী আর আহার নিদ্রা—শুধু মদ্যপানটা আর পরিমিতি ও নিয়মের বেড়ায় ঘিরে ফেলা গেল না।

ঠাকুরসাহেব ডাগডরকে ডেকে বলেছিলেন—সাদী কর ডাগডর।

ডাগডর মদ খেয়েই ছিলেন—বলেছিলেন—কভি না। এ কথা বলবেন না। তাহলে চলে যাব আমি।

—তোমার মেয়ে? তার কি হবে?

—কেন? ওই তো একটা মেয়ে ওকে নিয়ে থাকে—দুধ পিলায় দেখেছি, ওই-ই মানুষ করবে। মেয়েটা সুশ্রী এবং নোংরা নয়। স্বাস্থ্যও ভাল—। ওকে মাইনে দেব আমি।

ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—তা তুমি পেতে পার। কিন্তু তলব দিয়ে ওকে পাবে না তুমি। ও হল ঠাকুরসাহেবের ঝিয়ের মেয়ে; নিজের মেয়ের মত ভালবাসি ওকে। ও বিধবা হয়েছে—ওকে সাগাই কর না কেন?

—না। এ বাত অন্যে বললে আমি তার সঙ্গে লড়াই করতাম ঠাকুরসাব।

—বেশ, তবে ওর খাওয়াপরার আজীবন ভার তোমাকে নিতে হবে। সে নেবে তো?

সে ভার নিতে রাজী হয়েছিলেন—মণি-বউদির বাপ।

মণি-বউদি একটু হেসেছিলেন এবং বিচিত্র অর্থদ্যোতক একটি হাসি তাঁর মুখে ফুটিয়ে তুলে বলেছিলেন—কিন্তু যখন থেকে আমার মনে পড়ে ঘটনাগুলো; সে ধরুন পাঁচ ছ'বছর বয়স হবে, তখন থেকে আমি সরবতিয়া মাঈজীকে—মা বলেই ডেকেছি এবং আমাদের বাড়ীর গিন্নী হিসেবে দেখেছি। কাপড়চোপড় যা পরত তা অবিশ্যি ঘাঘ্‌রি কাঁচোলী ওড়না হলেও সেসব ছিল যেমন রুচিসম্মত তেমনি দামী। হিসেবের অঙ্কে সরবতিয়া মাঈজীর দাম ঝিয়ের দাম ছিল না। নাকে একটা হীরে ছিল—সেটা ঝক্‌ঝক্ করত। আরও একটা কথা বলি। সরবতিয়া মা সিঁথিতে সিঁদুর পরতেন তখন, আর সন্ধ্যেবেলা পাউডার মাখতেন। ঠাকুর-সাহেবের বাড়ীর মেয়েরা তাকে পরিহাস করে বলত—"ডগডর-গিন্নী"।

বাংলা-কথাটা বেহারী জিভে একটুখানি বেঁকে যেত। আমাদের জিভে যেমন হিন্দীভাষার বাঁকা তেরচা চালগুলো সরল 'আকারান্ত বা অন্তস্থর' বা ব-এর উচ্চারণ যেমন এলিয়ে সোজা হয়ে যায়—তেমনি ভাবে।

মণি-বউদির মনের এবং বোধের সূক্ষ্ম এবং পাতলা পরিচয়জ্ঞাপক কথাগুলোর মধ্যে সেদিন আর এক মণি-বউদিকে পাচ্ছিলাম।

মণি-বউদি বলেছিলেন—

সরবতিয়া মাঈজী বাবুজীকে কেমন করে জয় করেছিল সে কথা আমি শুনেছি ভাই—আমি জানি—কিন্তু সে আমাকে বলতে নেই। ও বলবার অধিকার আছে একমাত্র কালিদাসের মত মহাকবিদের। বাক্য এবং অর্থের মত, পার্বতী এবং পরমেশ্বরের মত, বাবা মাকে যারা অভিন্ন একাত্ম না ভাবতে পারে—তাদের অধিকার নেই বলেই আমি মনে করি।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

মণি-বউদি কি? এ বলছে কি? কানের পাশে কে যেন আবৃত্তি করে যাচ্ছিল—"বাগর্থ-মিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌঃ।"

সংসারে মনের মধ্যে একটা গোপন কুঠরী আছে—সেটার মধ্যে থাকে মনের কথা। শুধু কথা কেন? মনের কথা থাকে, মনের মধু থাকে, সবশেষের স্তরে থাকে জাদু। ও কুঠরীর দরজা সহজে খোলে না। কেন না ওই ঘরের দরজা কোন চাবিতে খোলেও না বন্ধও হয় না। কারণ ও দরজায় চাবি নেই। কোথায় আছে ওর চোরা-বোতাম, যে-বোতামে

হাত পড়লে আপনি খুলে যায়। আবার একটু অসতর্ক হলেই আপনি বন্ধ হয়। তখন মশাল জেলে বিস্ফারিত চোখে ওই বোতামটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর পাওয়া যায় না।

সেদিন মণি-বউদির ওই মনের ঘরের বন্ধ-দরজা চোরাবোতামে তাঁর বা আমার হাতের চাপ পড়ে খুলে গিয়েছিল—তা বলতে পারব না, তবে সেই খোলা দুয়ারের মধ্য দিয়ে মনের কথাগুলি মনের মধুতে অভিষিক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। তিনিও যেন গঙ্গাস্নান করে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মত উজাড় করে দিচ্ছিলেন নিজেকে।

হয়তো উচ্ছ্বাস একটু বেশী হয়ে গেল। কিন্তু না। উচ্ছ্বাস যদি হয়েই থাকে তবে বলব যে, এর থেকে কম উচ্ছ্বাস সেদিনের মণি-বউদিকে বা আমার নিজেকেও ঠিক বোঝাতে পারব না। উচ্ছ্বাসের এ গভীরতায় যদি নিজেরা না হারিয়ে যেতাম, যদি আমরা বাস্তব বুদ্ধিতে সজাগ থাকতাম—তাহলে আমরা নারী-পুরুষ হয়ে যেতাম এবং তখন আর ওইভাবে ওই নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসে থাকবার অধিকারই আমাদের থাকত না।

সে থাক। এখন মণি-বউদি নিজের জীবনের যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন সেগুলি বলি।

এরপর ন বছর চলে গিছল।

মণি-বউদি এগারো বছরের হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে সরবতিয়া মাঈজীর হাতে মানুষ হয়ে মণি-বউদিও একরকম হিন্দুস্থানী মেয়ে হয়ে পড়েছিলেন। তবু মণি-বউদির বাবার বাংলা ভাষার উপর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল—সেকালে ব্রাহ্মমেয়ে বিয়ে-করা বাঙালীর ছেলে হিসেবে।

হিন্দু বাঙালী যাঁরা প্রবাসী হয়ে অন্য-প্রদেশে বাস করতেন তাঁদের বাংলাভাষার উপর কোন আকর্ষণই ছিল না—তাঁরা গোড়া থেকে ইংরিজীকে মাথায় করতেন আর মাটির বুলি হিসেবে হিন্দী শিখতেন আপনা থেকে। বাংলা বলতেন ভুল—লিখতে আরও বেশী ভুল করতেন। যা বলতেন তাও হিন্দীর ছাঁচে ফেলে বলতেন—'ইংরিজী রাজভাষা হচ্ছে এবং ইংরিজী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা হচ্ছে সুতরাং বাংগালী ভাষা নিয়ে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছে বল তো!'—কিন্তু ব্রাহ্ম যাঁরা তাঁরা বাংলা ভাষাকে পরিস্ফুট করেছেন এবং বাংলাকে ভোলেন নি—কোনখানে গিয়েই। প্রবাসী পত্রিকা তার প্রমাণ। মণি-বউদির বাবা গোপীবাবু প্রবাসীর গ্রাহক ছিলেন এবং শুধু মণিকে নয়—সরবতিয়াকেও বাংলা বলতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। তবে মণি-বউদি কাপড়-চোপড় পরতেন হিন্দুস্থানী মেয়ের মত। খাওয়াদাওয়ায় চালেও হিন্দুস্থানী স্বাদগন্ধ প্রবল ছিল। হয়তো বাংলা শিক্ষাটাও কাজে আদৌ লাগত না যদি পর পর কতকগুলো ঘটনা না ঘটত।

প্রথম ঘটনা ঠাকুরসাহেবের মৃত্যু।

দুর্দান্ত ঠাকুরসাহেব বিরাশি বছরে মারা গেলেন—তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে লাগল মামলা। ঠাকুরসাহেবের বিয়ে করা বৌ পাঁচজন—এ ছাড়া কেনা দাসী, তার সংখ্যাও কম না। ঠাকুরসাহেব উইল করে সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। তাতে সরবতিয়াও কিছু পেয়েছিল। কিন্তু মামলা বাধল ছেলেদের সঙ্গে নাতিদের। অর্থাৎ ঠাকুরসাহেবের যেসব

ছেলে মারা গেছে তাদের সঙ্গে ঠাকুরসাহেবের জীবিত ছেলেদের। উইলও একখানা নয় তিনখানা। তার দুখানাতেই সাক্ষী ছিলেন মণি-বউদির বাপ। পক্ষ দাঁড়িয়েছিল চারটে। মণি-বউদির বাপ যে সাক্ষীই দিন—তিন বিপক্ষের রোষবহ্নিতে পড়তে হবেই। কালটা ১৯২২ সাল। মণি-বউদির বাবা গোপীবল্লভবাবু সে গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন পাটনায়। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর প্রাণই শুধু বিপন্ন নয়—আরও অনেক কিছু বিপন্ন—এরা তাঁর সম্পত্তিটা কেড়ে নিতে চায়, এদের মধ্যে আবার দুজন হাত বাড়িয়েছে সরবতিয়ার দিকে। সরবতিয়া মণিমালিনীকে যখন কোলে তুলে নেয় তখন ওর বয়স ছিল বিশ বছর; দশ বছর পর এখন তার বয়স ত্রিশ; যাকে বলে যৌবন গঙ্গার ভরাভাদর। এবং বাঙালী ডাক্তারবাবুর শিক্ষায় এবং সহবতে সে সুমার্জিত হয়ে এমনই অপরূপ হয়ে উঠেছিল যে তারা ঠাকুরসাহেবের ছেলে হয়েও এদিকে হাত বাড়াতে সংকোচবোধ করেনি।

এসব কথা অনায়াসে অসঙ্কোচে বলে যাচ্ছিলেন মণি-বউদি।

—জানেন ঠাকুরজামাই—তখন বারো বছরের আমি পশ্চিমে বড় হয়ে বেশ একটু হাপালো হয়ে উঠেছি এবং দেখতেও মন্দ নই; তার উপর আমার এই উঁচু দাঁত-দুটোতে তো আমাকে চব্বিশঘণ্টাই দেখন-হাসি ক'রে রেখেছে। সুতরাং বুন্দেলাদের সবাই বলে—আমায় দেখে ছোক্‌রী হাসে। সুতরাং আমার দিকে পর্যন্ত হাত, সে একখানা দুখানা নয়—ঠাকুরসাহেবের চার নাতির, এক ছেলের এই পাঁচজনের পাঁচ দু গুণে দশখানা হাত উদ্যত হয়ে উঠেছিল। বাবা ছিলেন গোঁয়ার মানুষ; ভীষণ জেদী। সে গোঁয়ারতুমি জীবনে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরও মজবুত হয়ে হাতীর দাঁত হয়ে উঠেছিল এবং মদ বেশী বেশী খাওয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বেশী প্রগল্‌ভ হয়েও উঠেছিলেন। প্রথমটা তিনি বেশ খানিকটা হাঁকডাক ক'রে লড়াই দেবার জন্য খুঁট পেতে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বুঝলেন, আজকাল স্ফটিকস্তম্ভ ফাটিয়ে নৃসিংহাবতার বের হন না, সাবিত্রীর সতীত্বকেও যম এতটুকু সমীহ করে না; এবং সত্য বা নীতি ইত্যাদির এমন কোন শক্তি-নেই যা নিছক পশুশক্তিকে বা বস্তুশক্তিকে হঠাতে পারে, হারাতে পারে।

আমার তখন এগারো বারো বছর বয়স, দিব্যি মনে আছে তখনকার কথা; বাবা মদ খেতে খেতে সরবতিয়াকে বলছিলেন—আমি হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম হয়েছিলাম। আজ থেকে নাস্তিক হলাম। কুছ নেহি হ্যায়—কুছ নেহি হ্যায়—। অবাঙমনসোগোচর মানে কুছ নেহি হ্যায়।

কিছু থাক বা না থাক—আমাকে নিয়ে বিপদ তখন এমন ঘনীভূত হয়েছে যে—দিন-কয়েকের মধ্যেই বাবা, আমাকে আর সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে, পালিয়ে এলেন বেহারশরীফ। কিন্তু বিহারশরীফও ১৯২২-২৩ সালে এমন নিরাপদ ছিল না যে—বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবদের সঙ্গে বিবাদ করে নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাস দুয়েক পর চলে এলেন পাটনায়। পাটনায় বসে মামলা জুড়লেন বুন্দেলাবাবুরের বিরুদ্ধে। তাতে টাকারই শ্রাদ্ধ হ'ল, ফল কিছু হ'ল না। এই সময়ে একদিন এলেন—আপনার এই দাদাজী।

দাদাজী। পরক্ষণেই বুঝলাম—।

প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে—মণি-বউদি বলেই দিলেন—মদীয় স্বামী, পতি, আপনার শ্যালক।

অর্থাৎ অমৃতদা।

* * *

মণি-বউদির বয়স তখন বারো বছর। ১৯১৪ সালে জন্ম—সুতরাং সালে সেটা ১৯২৬ সাল। অমৃতবাবু তখন ১৯২১ সালে ক'মাসের জেলের পালা সেরে বেরিয়ে এসে গঠনমূলক কাজে মন দিয়েছেন। অর্থাৎ ওই তুলোর চাষের জন্য নেওয়া জমিটাতে ফায়ার ক্লে'র খোঁজ পাওয়া গেছে। পতিত ব্রহ্মডাঙ্গা। বেনামীতে পড়ে ছিল। হঠাৎ বের হল মাটি। পূর্ব মালিকরা বিষয়ীর প্যাঁচ ক'ষে জমিটাকে ঘুড়ির মত অমৃতবাবু লাটাইয়ের সুতোর বাঁধন থেকে কেটে নিজের লাটাইয়ের সুতোয় লটকে নেবার আয়োজন করলেন। লেখাপড়াজানা অবিষয়ী লোকদের প্রতি বিষয়ী লোকদের গভীর শ্রদ্ধা এই কারণে—এঁরা সুবোধ বালকের মত 'যাহা পান তাহাই লইয়া' ঘরে ফিরে যান। কিন্তু অমৃতবাবু ঠিক তা না করে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নেমেছেন। জায়গাটা বেহারের সীমানার মধ্যে। সুতরাং বেহারের হাইকোর্ট দেখতে এসেছেন তিনি। সেই সূত্রে আলাপ হয়ে গেছে মণি-বউদির বাবার সঙ্গে। কথায় কথায় আলাপ গিয়ে পৌঁচেছে সম্পর্কের বা আত্মীয়তার দোরগোড়ায়।

অমৃতবাবু বলেছেন—বিহারশরীফে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন—তাঁরও নাম গোপী-জনবল্লভ চ্যাটার্জী—

চমকে উঠে গোপীজনবল্লভ ডাক্তার বলেছিলেন—চেনেন তাঁকে? কি ক'রে চিনলেন?

—চিনি না। তবে নাম শুনেছি।

—কি ক'রে? কার কাছে?

* * *

অমৃতবাবুর এক বান্ধবীর নাম রত্নমালা। সেই রত্নমালার দিদির নাম ছিল পুষ্পমালা। পুষ্পমালা এণ্ট্রান্স ফেল ক'রে নার্সের কাজ শিখছিল—ক্যাম্‌বেল ইস্কুলের হাসপাতালে। সে ওই ইস্কুলের একটি হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছে। নাম গোপীজনবল্লবভ চ্যাটার্জি। ব্রাহ্ম মেয়ে পুষ্পমালাকে হিন্দু-মতে বিয়ে করে সেই গোপীবল্লভও বেহারে এসে-ছিলেন। আর দেশে ফেরেন নি। শোনা যায় বেহারশরীফে তাঁর এখন অনেক পসার।

গোপীজনবল্লভবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন—আপনার নাম তো বললেন অমৃতলাল মুখুজ্জে। গন্ধে অবিশ্যি জাত বোঝা আজকাল আর যাচ্ছে না। কিন্তু ঠিক ব্রাহ্ম বলেও তো মনে হচ্ছে না! অবশ্য গান্ধীজীর ছকটার সঙ্গে ব্রাহ্ম ছকটা অনেক জায়গায় বেশ মিশে গেছে, তবু-ও তা যেন মনে নেয় না। তামাকু খান না চুরোটও খান না কিন্তু পান খান—মাথায় তেল মাখেন—। কান-ফোড়ার দাগ রয়েছে। কর্ণবেধের দাগ।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—না ব্রাহ্ম আমি নই, তবে জাত আমি মানি না।

—না মানুন। রত্নমালা তো গোঁড়া ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে। পুষ্পকে নিয়ে তো বেগ কম পাইনি আমি। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন খোঁটা দিয়েছে। আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেপারে সেঙ্ক করেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে রত্নমালার সম্পর্ক কতদিনের?

সেদিন অমৃতবাবু আজকের অমৃতবাবু ছিলেন না। সোজা মানুষ—এম-এ পাশ—দেশ-সেবক, চোখে অনেক স্বপ্ন, অকুণ্ঠ বা সর্বপ্রকার কুণ্ঠাবিমুক্ত সোজা খাপখোলা তলোয়ারের মত মন। একবিন্দু মরচের দাগ পড়েনি। তার গড়নে-দীপ্তিতে উদ্দেশ্য গোপনের এতটুকু চেষ্টা ছিল না। সোজাসুজি বলেছিলেন—রত্নমালাদের ইস্কুলে বছর দুয়েক মাস্টারী করেছিলাম; এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাস্টার ছিলাম। রত্নমালা ক্লাস টেনে উঠল সেবার। ক্লাসে ভাল মেয়ে ছিল। টেস্টের পর কিছুদিন কোচও করেছিলাম। তারপর ও পাশ করে আই-এ পড়তে গেল, আমি চাকরি ছেড়ে নেমে পড়লাম—দেশের কাজে।

—তারপর—?

—তারপর আর কি? রত্না এখন চাকরি মানে ইস্কুলে মাস্টারী করে—বাড়ীর সঙ্গে একরকম আলাদাই সে। স্কুলবোর্ডিংয়ের সুপারইনটেণ্ডেণ্ট।

—কিন্তু বিয়ে করেনি কেন? অবস্থার জন্যে?

—অনেকটা তাই বটে। মানে অবস্থা পাল্টানো তো সোজা নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া চাই। মানে এ-জীবনে বিয়ে আমরা করব না।

শুনে খুশি হয়েছিলেন গোপীজনবল্লভবাবু। বাড়ী এনেছিলেন অমৃতবাবুকে।

মণি-বউদি বলেছিলেন,—জানেন—সেদিন মানুষটিকে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। ১৯২৬ সাল—তখন ওর বয়স বত্রিশ বছর। লালচে চুল—লালচে টক্‌টকে রঙ, কটা চোখ। বাবা বলেছিলেন—লোকটা খাসা লোক—ক্যাট্‌স্ আই লোকটার। খুব পুশিং হবে। সে আমলে বারো বছরের মেয়েও প্রেমে পড়তে পারত। আপনার সঙ্গে ননদের বিয়ে যখন হয়, তখন তার বয়স তো শুনেছি এগারো ছিল।

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

মণি-বউদি বললেন—আমি তখন বারো, কিন্তু আপনার দাদার প্রেমে আমি সেদিন ঠিক পড়িনি। পড়লাম পরে। ওই মাসী রত্নমালার সঙ্গে বিবাদ বাধল। সেই বিবাদে আমি জোর ক'রে এঁর প্রেমে পড়লাম—এঁকে ছিনিয়ে নিলাম মাসীর কাছ থেকে। মাসীর উপর একটা আক্রোশ আমার গোড়া থেকে—একেবারে সেই প্রথম দেখা থেকেই জন্মে গেল। ওর চোখে আমি দেখলাম আমার শত্রুকে—আমার চোখের মধ্যেও সে বোধ হয় ঠিক তাই দেখেছিল—নিজের জীবনের সবথেকে বড় শত্রুকে দেখতে পেয়েছিল।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

* * *

মণি-বউদি বললেন—বাবা মানুষটা ছিলেন দিল-দরিয়া মানুষ। সত্যবাদী মানুষ। সেটা এঁর বেশ ভাল লেগেছিল। বাবারও ভাল লেগেছিল—দেশ-সেবক—প্রেমিক লোক।

বলেছিলেন—তুমি আমার এখানে এসে উঠবে এবার থেকে। আরে আমার শালীর সঙ্গে প্রেম করেছ। বিয়ে করনি, করবে না। ওয়াণ্ডারফুল। এখানে এসে উঠবে। অনেক জায়গা এখানে। বুঝেছ? এবং আমার উপার্জন মন্দ নয়।

উনি উঠতেন তাই।

মাস ছয়েক পর। সেবার বোধ হয় তৃতীয় বার উঠেছেন। দিন পাঁচেক আছেন। সেবার ঠিক মামলার জন্যে যাননি। গিয়েছেন রাজগীর-নালান্দা যাবেন বলে। মাসীকেও নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু মাসী যাননি। মাসী যাননি সরবতিয়ার জন্যে—সেটা পরে বুঝেছিলাম। যাকগে। বাবা কলে বেরিয়েছিলেন; একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল—, বাবা সেইটেতে চড়ে কলে বেরুতেন। সেদিন উনিও সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল কল সেরে বাবা ওঁকে নিয়ে পাটনা সিটি দেখিয়ে আনবেন। পথে গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগে গাড়ীখানার পিছনের একটা চাকা ভাঙল। সেই দিকের কোণে বসেছিলেন বাবা। বাবা বসেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত খানিকটা বেরিয়েছিল এই পর্যন্ত। হাসপাতালে নিয়ে গেল সেই অবস্থায়। অবস্থা দেখে ডাক্তারেরা বললে মারা গেছেন। সেরিব্রেল হেমারেজ হয়েছে। আপনার শ্যালকও আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু সে সামান্য আঘাত। হাসপাতাল থেকে খবরটা নিয়ে উনিই ফিরে এলেন। এক মুহূর্তে আমরা অনাথ হয়ে গেলাম। আমি আর সরবতিয়া মা। কিন্তু উনি আমাদের পরিত্যাগ করলেন না। ওখানকার সমস্ত দায় চুকিয়ে আমাদের নিয়ে এসে তুলে দিলেন আমার মাসী রত্নমালা দেবীর বাড়ীতে। রত্নমালা দেবী খবরটা জানতেন, পত্রযোগে খবর তিনি পেয়েছিলেন, প্রতীক্ষা করে তিনি দাঁড়িয়েও ছিলেন। আমি মাসীর মধ্যে মাকে প্রত্যাশা করিনি, মাসীকেই প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম আমাকে দেখে মাসীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

বাবা রেখে যা গিয়েছিলেন তা খুব খারাপ ছিল না। বরং ভালই বলতে হবে। সরবতিয়া মা বা আমি ওঁদের গলগ্রহ ছিলাম না। তবু মাসীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে যে কি জ্বালা আপনাকে কি বলব।

নাকের পাশে ঠোঁটের ভঙ্গিতে এমন একটা বিষ ফুটে উঠেছিল আপনাকে কি বলব। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মাসী আমাকে বলেছিল—ওকে ছেড়ে এদিকে এস। গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, তাও জান না? ছি-ছি-ছি। জানবে কি করে? শেখাবে কে?

তারপর ওঁকে বলেছিলেন—তুমি কি বলে' ন্যাট উয়োম্যানটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে বল তো? আমি ওকে ঠাঁই দিতে পারি না। উইদাউট টেকিং মাই কনসেন্ট—এ কি করলে তুমি? ও-তো একটা প্রস্টিটুট।

সরবতিয়া মা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। বাবার কাছে সে দশ বছর ছিল—বাবা তাকে গড়েপিটে তৈরী করেছিলেন

নিজের পছন্দমত ক'রে। ইংরেজী শব্দ প্রক্ষেপ দেওয়া কথা সে মোটামুটি বুঝত। দিন সাতেক সে বহু জ্বালা বহু উত্তাপ সহ্য করেও ছিল আমার জন্য। সাতদিন পর সে আমাকে বললে—বেঁটিয়া—আমি চলে যাই-রে। তুই কাঁদিস নে। আমার জন্যে ভাবিস নে। আমাকে যা তোর বাপ দিয়ে গেছে, তাই দিয়েই চলে যাবে বাকী দিনগুলো। আমি কাশী চলে যাবো।

তাই সে গিছল।

বাবা তাকে গয়নাই শুধু দেননি—তার নামে পাঁচ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেটও কিনে দিয়েছিলেন।

মণিবউদি বলেছিলেন—আরও একটা জিনিস দিয়েছিলেন বাবা। সেটা হ'ল—জীবনে একটা বিচিত্র বোধ। যে বোধে মানুষ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সরবতিয়া মাঈ তার ক্যাশ সার্টিফিকেট তাব নিজের কাছে রাখত। কারুর হাতে সে দেয়নি। বাবা তাকে খানিকটা লেখাপড়াও শিখেয়েছিলেন। হিন্দি, বাংলা দুটো ভাষাই সে বলতে পারত, পড়তে পারত।

সুতরাং মাসীর কাছে আমাকে রেখে 'একলা চলরে' বলে কাশী চলে যেতে তার কোন বাধাই হয়নি। এতটুকু ভয়ও সে পায়নি। তবে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে যে কষ্ট সে পেয়েছিল সে-কষ্ট পাবার কথা শুধু নিজের মায়ের।

ছয়

মণি-বউদি সেদিন বসে বসে তাঁর গোটা জীবনের সমস্ত কথাই বলেছিলেন আমাকে! সেদিনের রাতটা ছিল চাঁদনী রাত। ১৯৪২ সাল। শহরের রাস্তার এবং বাড়ীঘরের বাইরের লাইটগুলো ব্ল্যাকআউটের ঠুঙি আটকে পড়ে মাটির বুকেই যেন হাত-পা বাঁধা হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল; শূন্য-মণ্ডলে জ্যোৎস্না পেয়েছিল অবাধ খোলামেলা; কোনো প্রাসাদের জনহীন উদ্যান-সরোবরে একাকিনী স্নানার্থিনীর মত জ্যোৎস্না যেন বাঁধানো ঘাটের পৈঠেতে বসে সুঠাম শুভ্র বরতনুখানিকে সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিল। হয়তো জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখছিল। আমরা দু'জনে তারই মধ্যে খোলা জানালাটার ধারে বসেছিলাম। মণি-বউদি বলে যাচ্ছিলেন, আমি শুনছিলাম। কোন সঙ্কোচ ছিল না। থাকলে ওই রূপসী জ্যোৎস্নার মায়াবিভ্রমে আমরা দু'জনে অনায়াসে কপোত-কপোতী হয়ে যেতে পারতাম। এই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নারী মণি-বউদি চুপ করে যেতেন এবং তার বদলে বকতে শুরু করতাম আমি। কপোতগুঞ্জন তুলে আমি তাঁকে প্রদক্ষিণ করে ফিরতাম। অনায়াসেই তা হ'তে পারত। আমাদের উভয়ের অজ্ঞাতসারে, জীবনের আচরণে সকল শালীনতা বজায় রেখেই হতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। সাক্ষী তার আমি। আর যাঁকে সাক্ষী মানতে পারি তাঁকে একালের মানুষেরা জীবিত বলে স্বীকার করেন না। ঈশ্বর মৃত

একথা এ যুগের দ্বারা ঘোষিত।

* * *

পৃথিবীতে জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষনভঙ্গুর ; জীবনের কথা কিন্তু ক্ষণস্থায়ীও নয় ক্ষণভঙ্গুরও নয়। পৃথিবীতে মানুষ মরে যায়, মরা মানুষটাকেও মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু তার কথা থাকে। তার চিহ্নও থাকে—সে কোথায় কোন দিন কপালে সিঁদুরের টিপ প'রে তার আঙুলটি মুছে গেছে—তার দাগটি রয়েই যায়। বিবর্ণ হতে হতে ধুলোময়লার আবরণের তলায় লুকোয়। ধুলোময়লা ধুলেই আবার পাওয়া যায় তাকে। খুঁজলে হয়তো আদিম মানুষটির কোন-না-কোন চিহ্ন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও পড়ে আছে, লুকিয়ে আছে, কোনদিন বেরিয়ে পড়তে পারে।

মণি বউদি বললেন—একটু বসুন। আমি এক্ষুনি এলাম ব'লে। যেন হঠাৎ মনেপড়া কাজের তাগিদে উঠে চলে গেলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে আমাকে বললেন—পড়ুন।

একখানা চিঠি। চিঠিখানা নিজের হাতেই রাখলেন এবং বললেন—সম্বোধনটুকু পড়ুন আর নিচে লেখক বা লেখিকার নাম পড়ুন।

দেখলাম—'প্রিয়তম অমৃত', আর পরিশেষে 'তোমার রত্না'।

মণি-বউদি বললেন—খানিকটা আমি পড়ে শোনাই। সবটা শোনাব না। শোনানো যায় না। পড়তে দিতেও যেন কেমন লাগবে আমার, দেব না। শুনুন।

"যে রমণী তোমাকে কিশোরী বয়স হইতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভালবাসিয়াছে, তোমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে, যে তোমার প্রিয়তমা ছাত্রী ছিল, যে প্রথম যৌবনে তোমার জন্য পাগলিনী হইয়াছিল, ঘর-সংসার সব ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিল, যে তোমার জন্য রাত্রির পর রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছে ; অবশেষে তোমার কথায় তোমার নিকট দীক্ষা লইয়া কুমারী থাকিয়াই আজও অবধি তোমার পথ চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই তুমি এত বড় সন্দেহ করিবে, এতখানি ছোট করিবে, এতখানি ছোট চোখে নিরীক্ষণ করিবে তাহা কোনদিনই এই হতভাগিনী কল্পনা করিতে পারে নাই।

"তুমি আমাকেই শেষ পর্যন্ত চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে ? আমি মণির গহনা চুরি করিব, ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলা নষ্ট করিয়া দিব ? 'মণি' আমার দিদির মেয়ে। তোমার চেয়ে আমি তাহার অনেক আপন জন। আমি তাহার আপন মাসী। আমি এই পাপকার্য করিব ?

"তুমি কল্য আমার মুখের উপর বলিলে যে, আমি তাহাকে হিংসা করি। আমি মণিকে হিংসা করিব ?"

এর পরই মণি-বউদি চিঠিখানা মুড়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখলেন এবং একটু হেসে বললেন—'মানুষ যায় কথা থাকে' কথাটা আপনাদের মানে আমার স্বামীর গোষ্ঠীর কাছে শেখা কথা। কথাটা যেমন সত্যি তেমনি ভাল। আমার মাসী রত্নার কথাগুলোই শুধু আমার মনে খোদাই করা আছে তাই নয়, তার চিঠিপত্তর এবং কয়েকটা জিনিস আমি

অত্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। একটা হারের লকেট দেখাই দাঁড়ান।

উঠে দাঁড়িয়েও বউদি বসলেন—পরে দেখাব আপনাকে। লকেটটায় মীনা করে লেখা 'মালা'। ওটা উনি দিয়েছিলেন মাসীকে। মায়ের নাম ছিল পুষ্পমালা, মাসীর নাম রত্নমালা —আমার নাম মণিমালা। কিন্তু ওটা ছিল মাসীর।

আগেই তো বলেছি, আপনার দাদা এম-এ পাশ করে স্কুলে মাস্টারী করতে গিয়ে মাসীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। তারপর সে প্রেম এমন জমাট হল যে মাসী ঘর ছাড়ল, এঁর জন্যে মাস্টারী করতে লাগল। দু'জনে সেকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশ যতদিন স্বাধীন না হবে ততদিন বিয়ে করবেন না। পরে আপনার দাদা আমাকে এর একটা বিবরণ দিয়েছিলেন। সেটা হল এই যে, ওঁরা দু'জনে একদিন রাণা প্রতাপসিং থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন—সেকালে; তাতেই দেখেছিলেন মা কালীর সম্মুখে প্রতাপসিং সর্দারদের শপথ করাচ্ছেন—মা কালীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর, যতদিন চিতোর না স্বাধীন হবে ততদিন আমরা বৃক্ষপত্রে ভোজন করব, তৃণশয্যায় শয়ন করব। এইরকম একটা মস্ত ইতিহাস-বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা।

একটু হেসে বলেছিলেন—এখন নাকি চিতোরের রাণাবংশের সকলে এবং রাজপুত সর্দারদের অনেকে থালার নিচে গাছের পাতা রাখে আর খাট পালংকের গদির তলায় কয়েক-গাছা খড় রেখে দেয়। এঁরা দু'জনে সেদিন থিয়েটার থেকে ফিরে পরের দিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এবং তাই পালনও করেছিলেন দু'জনে। কিন্তু হঠাৎ বিধাতা-পুরুষই যেন আমাকে ওঁর ঘাড়ে দিলেন চাপিয়ে।

মাসী ব্রাহ্মঘরের মেয়ে, সরবতিয়া মাঈকে দেখে তার চটবার হয়তো কারণ ছিল। কিন্তু বারো বছরের আমাকে দেখে তো চটবার কারণ ছিল না, থাকবার কথাও নয়, তবু মাসী আমার আমাকে দেখেও চটলেন।

আমার বয়স তখন বারোর মাঝখান পেরিয়ে তেরোর কোঠার দিকে বেশী ঝুঁকেছে। আর সেকালে বারো তেরো বছরেই মেয়েরা এ বিষয়ে অনেক বেশী পেকে উঠত। সুতরাং মাসী যাই বলুন, যে ভাবে ভঙ্গিতে বলুন, আমি তার গন্ধ থেকে ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাসী আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর দৃষ্টিতে দেখছে। আপনার দাদার বয়স তখন বত্রিশ তেত্রিশ, মাসীর বয়স ছাব্বিশ, আমার বয়স বারো। তাতে কিছু যায়-আসে নি। ত্রিভুজটি দস্তুরমত শক্তপোক্ত হয়েছিল। সেই বারো বছর বয়সেই কেউ যেন খুঁচে, খোঁচা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে আমাকে মাসীর চ্যালেঞ্জ দিয়ে জীবনের আসরে নামিয়ে দিল। এবং নামিয়ে দেবামাত্র আমি দিব্যি সে চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করে কোমর বেঁধে নেমে গেলাম লড়তে।

কেমন ভাবে জানেন? যাত্রীতে ঠাসাঠাসি কামরায় একটুখানি জায়গা পেয়ে কেউ যদি হঠাৎ মাঝখানে বসে পড়ে, এমন কি অক্ষম হয়েও টলে পড়ে যায়, তা হলেও সঙ্গে সঙ্গে পাশের যাত্রীর কনুই দুটো যেমন রুষ্টভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ওই ব'সে-পড়া যাত্রীটির কনুই বা সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে প্রতিরোধ করে, ঠিক তেমনিভাবে ব্যাপারটা শুরু হল।

রত্না মাসী সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে যে ঝগড়া শুরু করলে, তা দেখতে-শুনতে বেশ একটা

পবিত্র গঙ্গাজল-খাওয়া হবিষ্যান্ন-করা তপস্যা গোছের ব্যাপার হলেও বারো বছরের মণিমালার মন তাতে প্রতারিত হয়নি, সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল, মাসী ঝিকে মেরে বউকে শেখাচ্ছেন। অর্থাৎ সরবতিয়া উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য সে অর্থাৎ বারো বছরের মণি।

বারো বছরের মণিমালার কৈশোর বাল্যকালকে দুই-এক নয়, বোধহয় চার পাঁচ পা পিছনে ফেলে যৌবনের দিকে যেন দীর্ঘ পদক্ষেপে বেশ একটু জোরেই হাঁটছিল। সরবতিয়া থাকলে হয়তো সরবতিয়ার প্রসঙ্গ নিয়েই লড়াইটা করতো রত্নমালা, করতো অমৃত মুখুয্যের সঙ্গে। বলতে পারত, নিজেরা পরস্পরকে ভালবেসেও যখন ব্রহ্মচর্যকে মাথায় করে তপস্যা করে যাচ্ছি, তখন সরবতিয়ার মত ভ্রষ্টার কলঙ্কিত ছোঁয়াতে কেন পড়ব? কেন?

কিন্তু সরবতিয়া মাঈ তখন চলে গেছে। সুতরাং সোজাসুজি ঝগড়া বাধল আমাকে নিয়ে।

হেসে মণি-বউদি বলেছিলেন—মেয়েদের কথা আপনি বোঝেন, লেখক মানুষ। ইদু পুরুষে বিমলার চরিত্রের মধ্যে ব্যাপারটা সুন্দর করে দেখিয়েছেন। কল্যাণীকে যখন নুটু ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন বিমলা এসে মহিমময়ীর মত বলছে—যেয়ো না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও। স্বামীকে তিরস্কার করে তাকে ঘরে আশ্রয় দিচ্ছে। আবার নুটু যখন কল্যাণীর মুখ চেয়ে সুশোভনকে সহ্য করছে, তখন আগুন হয়ে এসে বলছে—আমার অরুণ যদি সুশোভনের মত হত, তা হলে কি তুমি তাকে সহ্য করতে?

ঠাকুরজামাই—আমার মাসী রত্নমালার চরিত্র ঠিক তাই। কল্যাণী আপনার নাটুকে চরিত্র, অথবা এমনি প্যাসিভ না-হলে নাটক জমত না, অন্ততঃ এইভাবে জমত না। আমি কল্যাণীর মত এতখানি কনসাস ছিলাম না। নিজের শুচিতা নিয়ে এতটুকু আশঙ্কাও ছিল না; কথাটা মনেও উঠত না। তা ছাড়া আমার বাবা টাকাকড়ি রেখে গিছলেন, গয়না রেখে গিছলেন, আমি ওদের উপর ভার-বোঝাও ছিলাম না। বুঝেছেন ব্যাপারটা?

শুধু ব্যাপারটাই বুঝিনি, আরও বুঝেছিলাম যে, মণি-বউদি আমার আশ্চর্য মেয়ে। এমন ক'রে নিজেকে সে খতিয়ে খতিয়ে দেখেছে।

মণি-বউদিকে এ সম্পর্কে সচেতনভাবে সক্রিয় করে দিয়েছিলেন ওঁর সেই মাসী রত্নমালা এবং আংশিকভাবে অমৃতবাবু।

সরবতিয়া চলে যাওয়ার পরের দিনই। একটা ঘরে একলা তখনকার বারো বছরের মণিমালা খুব কাতর হয়েই বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছিল। পাশের ঘরে অমৃতবাবু চুপ করে-বসে ছিলেন। আপন মনে বকছিলেন মণিমালার মাসী রত্নমালা। বলছিলেন—গেছে বেশ হয়েছে। একটা প্রস্টিট্যুট—একটা পাপ—বেশ হয়েছে গেছে। গঙ্গাজল দিয়ে ঘরদোর ধুয়ে ফেলা উচিত।

অমৃতবাবু কোন উত্তর করেন নি। মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন, যেন ভাবছিলেন।

কি ভাবছিলেন তিনিই জানেন। মণিমালা ছিল পাশের ঘরে; মাঝখানের খোলা দরজাটা দিয়ে মধ্যে মধ্যে তীর্যক দৃষ্টিতে সে ও ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল। মাসীর কথায় উত্তাপে ও তীব্রতায় তার চোখে জল পড়লেও আশ্রয়স্থল অমৃতবাবু কি বলেন শুনবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল; কথা শুনতে না পেয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে অমৃতবাবুর মুখ দেখে বুঝতে চাচ্ছিল, মন তাঁর কি বলছে। অমৃতবাবুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকাটা তাকে যেন ভরসা দিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল রত্না মাসীর কথা তিনি ঠিক সমর্থন করতে পারছেন না।

মাসী সেটা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছিল, বলেছিল, কি—? কিছু বলছ না যে? কথাগুলো খুব পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকেছিলেন, যেন প্রতীক্ষা করেছিলেন তাঁর উত্তরের; উত্তর না পেয়ে ফেটে পড়েছিলেন—শেষ। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শেষ।

অমৃতবাবু এতক্ষণে বলেছিলেন—আঃ, কি করছ রত্না? মেয়েটি পাশের ঘরে রয়েছে।

—হ্যাঁ রয়েছে। কাঁদছে। হয়তো জেগে আছে। শুনছে। তাতে কি হয়েছে? আমি ওর মাসী। মায়ের সহোদরা। তুমি কে? তোমার এত দরদ?

—দরদ মানুষের জন্যে মানুষের হয়, সে সম্পর্ক থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। এমন কি জন্তুর জন্যেও হয়; ওর দুঃখ একটা হয়েছে সেটা মানতেই হবে। সে-মেয়েটি ওকে মায়ের মতই মানুষ করেছিল। ভালবাসত।

—মায়ের নামটা মুখে এনো না। নামটা কলঙ্কিত হবে। একটা ঝি, বাপের মিস্ট্রেস, তার মা ছিল বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের রক্ষিতা। পাপ। মূর্তিমতী পাপ। সেই পাপের হাত থেকে ওকে আমি রক্ষা করেছি।

* * *

সে এক অন্তহীন এবং অর্থহীন, অন্ততঃ নিরর্থক, জোর করে বাধানো ঝগড়া। শুরুই হল কিন্তু শেষ হল না কোন দিন। দিন দিন বেড়েই চলল অকারণে।

সরবতিয়ার উপলক্ষ পুরানো হয়ে গেল—ঘষে প্লেন হয়ে যাওয়া বাক্স এবং মিইয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের মত হাজার সংঘর্ষেও আগুন যখন জ্বালানো গেল না, তখন সরাসরি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আগুন জ্বলল।

১৯৪২ সালে সেদিন রাত্রে নিজের জীবনের গল্প বলতে বলতে যেন হঠাৎ হেসে মণি-বউদি বললেন—আগুন জ্বালানো তো খুব কঠিন নয় ঠাকুর-জামাই, কিন্তু আগুন জ্বেলে যাকে পোড়াতে চাই তাকে পোড়ানো খুব কঠিন কথা। কারণ, যাকে পোড়াতে চাই তারও তো একটা আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। আগুন প্রতিহত হলে ফিরে গিয়ে যে জ্বালিয়েছে তার কাছে চায় তার ক্ষুধার খাদ্য; অথবা পূজার বলি, যাই বলুন। অশান্তি করে গেলে তো আগে নিজেকে অশান্ত হতে হয়; সেই তো আগুনে জ্বলা। মাসী আমার আগুন জ্বালতে গিয়ে গোড়াতেই আগুন জ্বাললে নিজের বুকে, তারপর থেকে

আঙুল নিয়ে অগ্নিবান ছুঁড়তে লাগল ভাগাভাগি করে আমাদের দু'জনের দিকে।

সরবতিয়া প্রসঙ্গ পুরনো হ'ল, মুছে গেল ; তারপর শুরু হ'ল, এ অসভ্য মন্দ-তরিবৎ বিশ্রী-সহবৎ মেয়েকে নিয়ে আমি করব কি ? এবং ওঁকে দৃঢ়স্বরে দায়ী করলেন, কেন তুমি ওকে এনে ঘাড়ে চাপালে ? কেন ? কি তোমার স্বার্থ ?

স্বার্থ কথাটা শুনে অমৃতবাবু প্রথম দিন বোমার মত ফাটলেন।—স্বার্থ ? তুমি স্বার্থ খুঁজছ ? একটি অসহায় মেয়ের বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, আমাকে বলে গেলেন—ওকে দেখো ভাই তুমি। রত্নমালাকে বলো—বলেই আমাকে ভার দিয়ে গেলেন। I promised—and I tried to keep that promise.—তোমার কাছে এনে দিয়েছি।

—আমি কেন এ দায়দায়িত্ব নিতে গেলাম ? কি গরজ আমার ?

—তোমার দিদির মেয়ে। তুমি মাসী।

—কিন্তু সে দিদি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে চলে গেছল একজন সমাজের বাইরের লোকের সঙ্গে।

একটু হেসে অমৃতবাবু বলছিলেন—থাক। এর পর আর পা বাড়িয়ো না রত্না, জায়গা নেই।

রত্নমালা কিন্তু এতেও থামে নি। শূন্যলোকেই পা-ফেলে আকাশপথে চলতে চেষ্টা করে ছিল। বলে ছিল—আমি ভালবেসেছি তোমাকে কিন্তু নিজেকে কলুষিত করি নি।

একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে অমৃতবাবু বলেছিলেন—এমন হবে তা ভাবি নি আমি। ও মেয়েটি আর্থিক দিক থেকে কারুর ভার-বোঝা নয় এবং স্বভাবটভাবের কথা—; থাক সে-কথা। প্রয়োজন নেই সে বিতণ্ডায়। ওকে আমি কোন ভাল রেসিডেনসিয়েল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

মাসী চমকে উঠেছিল ঠাকুর-জামাই।

বলতে বলতে মণি-বউদি হেসে উঠে বলেছিলেন—সে চমক আমার মনে আছে, হাতে চায়ের কাপ-ডিশ ছিল, চা খেতে-খেতে ঝগড়া হচ্ছিল ; মাসী আমার চমকে বলে উঠল—কি বললে ?

সঙ্গে সঙ্গে হাতের ডিশটার উপর থেকে কাপটা পড়ে গেল প্রথমে মাসীর কাপড়ে তারপর মেঝের উপর। এবং তপ্ত চায়ের ছ্যাঁকায়—'মাগো—মাগো' ব'লে, যাকে বলে ঝেড়েপেড়ে উঠে দাঁড়ানো, সেইভাবে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। যথাসাধ্য কাপড় ঝেড়ে চা ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন কাপড়খানা ছাড়বার জন্য। যাবার সময় বলে গেলেন—সারটেনলি নট। ইউ কান্ট, ইউ কান্ট ডু ইট। তোমার কোন অধিকার নেই। কো—নো—অধিকার নেই। সী ইজ মাই নিস্—আমার সহোদর বোনের মেয়ে, আমি মাসী, আমিই তার একমাত্র গার্জেন। তার সম্বন্ধে তোমার কোন অধিকার নেই। আশা করি সে সম্পর্কে তুমি কনসাস্ হবে।

এবার আমার কথা বলি ঠাকুরজামাই।

এ ভারী মজার ব্যাপার। খেলা তো ঠিক নয়। কারণ খেলা মানুষ ইচ্ছে করে খেলে বা খেলতে বসে। এতে বা সংসারে যা ঘটে তাতে মানুষের ইচ্ছের কোন দাম নেই ; এতে যে যা করে—তাকে তাই একরকম যেন করতেই হয়। বর্ষার দিনে পোকাগুলো আলো দেখে উড়ে আসে, শুকনো দিনে আসে না, কিন্তু মাটি ভিজলে আসবেই ; যেন নেমন্তন্ন দেওয়া আছে। আলোর চারিধারে পোকা ওড়ে, কেন ওড়ে পোকা জানে না ; টিক্‌টিকি ঘোরে পোকা খাবার জন্যে। তাকিয়ে দেখলে দেখবেন টিক্‌টিকিটা ঠিক খেলা করছে, পোকাগুলো আলোকে ঘিরেও খেলছে, কিন্তু তাতে চলছে জীবনমৃত্যুর পালাগান।

যে-খেলায় বা যে-পালায় আমি ভিজে মাটির আশ্রয়হারা পতঙ্গ, পাখা মেলে অমৃতবাবুরূপী আলোটির কাছে উড়ে আসতে গিয়ে মাসীরূপী টিক্‌টিকিটির গ্রাসের মুখে পড়েছিলাম, সে পালায় আমিও ক্রমাগত ওই আলোটাকেই স্বাভাবিকভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। টিক্‌টিকিটা যখনই তাড়া করেছে তখনই আমি ওই আলোর ফানুশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছি।

প্রথম শুরু হয় স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ দিয়ে। উনি এলেই আবার মুখে হাসি ফুটত। আশ্বস্ত হতাম। এবং সুযোগমত অসুবিধার কথা বলতাম।

মাসীই এগুলো ধরিয়ে দিত। বলত—তুমি ওর সম্বন্ধে কোন ইন্টারেস্ট নিয়ো না।

ইনি বলতেন—কেন ?

—কেন কি ? তোমার উচিত নয়। তুমি এলেই মেয়েটা যেন হেসে ওঠে। তোমার কাছে ও আমার নামে লাগায়।

ইনি বলতেন—না। তা লাগায় না। তবে দু' চারটে অসুবিধার কথা বলে। আমাকে না-বলে কাকে বলবে ? আর তো কাউকে চেনে না। এবং ওর বাপের কাছে আমি কথা দিয়ে খানিকটা মরালি রেস্‌পন্‌সিবল, তাও অস্বীকার করতে পারি না। তুমিই বল না। পারি কি ? তা ছাড়া সংসার অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ়, এখানে মানুষ আশ্রয়স্থল স্বাভাবিকভাবেই খোঁজে। তাকে অভিযোগ করা চলে না।

মাসী তৎক্ষণাৎ কথাটার বাঁকা মানে করে নিয়ে বলত—তার মানে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ়, কেমন ?

ইনি বলতেন—না, তা আমি বলি নি।

—তাই বলছ। নইলে ও কথার মানে কি হয় ? ওর কাছে সংসার বলতে তো আমার এই কোয়ার্টারটুকু এবং আমি।

ইনি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলেন—আমি আর তোমার এখানে আসব না।

মণি বউদি বললেন—সত্যিই আসা ছাড়লেন ভদ্রলোক। ঘটনাটা প্রায় এক বছরের মাথায়। এলেন না মাসখানেক।

তারপর মাসী চিঠি লিখলে প্রেমের টানে। এবং লুকিয়ে আমিও চিঠি লিখলাম প্রাণের দায়ে। কারণ মাসী এই ভদ্রলোকের না-আসার জন্য আমাকে ষোল আনা দায়ী করে আমার

উপর আক্রমণ তীব্রতর করে তুললেন। আমি বাঁচবার পথ বা আমাকে বাঁচাতে পারে এ আক্রমণ থেকে এমন মানুষ খুঁজতে গিয়ে এঁকে ছাড়া আর দ্বিতীয়জনকে মনে মনে খুঁজে পেলাম না।

সেই শুরু হল চিঠি লেখা। ইনি এলেন চিঠি পেয়ে কিন্তু মাসীর কাছে আমার চিঠির কোন উল্লেখ করলেন না। অথচ আমি চিঠির জবাব পেয়ে গেলাম। এক ফাঁকে আমাকে একটা টুকরো কাগজে লিখে হাতে গুঁজে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—"তোমার কোন অসুবিধা হলে আমাকে এমনি করে চিঠি লিখে জানিয়ো।"

* * *

মণি-বউদি হেসে বললেন আমাকে—সেই ১৯৪২ সালের সেই রাত্রিটিতে, হঠাৎ কাহিনীর মাঝখানে ছেদ টেনে বললেন—মুখোমুখি কথা বলে প্রেম জমানো বা প্রেমে দানা বাঁধানোর ভিয়েনটা কঠিন ঠাকুরজামাই; আমাদের দেশে মা-বাপে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেম একেবারে রেডিমেড জামা পোশাকের মত গায়ে উঠে চেপে বসে। হাতে বড় হলে খাটিয়ে নেয়, খাটো হলে জোড়াতালি দিয়ে নেয় অথবা আজন্মই খাটো জামা পরে কেটে যায়। তার মধ্যেও প্রেম জমাতে ওই প্রেমপত্র ভরসা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থিয়েটারে যাত্রায় রিহার্শ্যালে অভ্যেস করে তবে বলা যায়—'ওগো তোমায় ভালোবাসি।' এমনিতে এটা ভারী কঠিন। চিঠির মত সুবিধে মুখোমুখি চোখে চোখ রেখে 'ভালবাসি' কথাটা বলতে হয় না; নির্জন স্থানের দরকার হয় না। দিব্যি 'কেমন আছ? কেমন আছ?' লিখতে লিখতে দিব্যি লেখা যায়—"হৃদয়ে বড়ই যাতনা হইতেছে আজকাল—কেন তাহা বুঝিতেছি না?" সঙ্গে সঙ্গে ও তরফ থেকে উৎকণ্ঠিত উত্তর আসবামাত্র আবার দিব্যি লেখা যায়—"হৃদয়ে কেন যাতনা হইতেছে তাহা কি বুঝিতে পারেন না?"

মণি-বউদি প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিলেন। বাক্যে প্রগল্‌ভা, হাস্যে প্রগল্‌ভা, চিত্তেও বুঝি বা প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটি নির্বিকারত্ব ছিল, সেটা আমি অতি অনায়াসেই অনুভব করেছিলাম।

বাল্যবয়সে প্রেম করেছিলেন, জীবনসংকট ও সমস্যার যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে। তখন তার মধ্যে বিলাসের বৈভব ছিল না, হয়তো বা কোন মোহেরই স্থান ছিল না। আর আজ—অর্থাৎ ১৯৪২ সালের সেই রাত্রিটিতে স্মৃতিস্মরণের মধ্যে বিলাস-কৌতুক ও মোহের সরস জীবন-ভাণ্ডটি উপচে উপচে পড়ে আমাদের দুজনকে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

মণি-বউদি অবলীলাক্রমে বলে গেলেন, কবে কখন কোন চিঠিতে যে ওঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছিলাম তা আমি জানি না। উনিই বা যে কবে আমাকে চেয়ে ছিলেন মনে মনে তারও হিসেব ওঁর ঠিক নেই। কিন্তু এ সবের ঠিক হিসেব রেখেছিলেন রত্না মাসী। তিনি চিঠির খবর সন্দেহ করতেন কিন্তু ধরতে পারতেন না। ফলে আমার উপর নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছিল। বাড়ছিল আমার পড়াশুনো উপলক্ষ করে এবং ওঁর সঙ্গে ঝগড়ার পরিমাণ বাড়ছিল যে-কোন ছুতো অবলম্বন করে। সুতরাং তিনি বলতে পারতেন কার চোখের ভাষায় কবে কোন তারিখে

চাওয়ার কথা ফুটে উঠতে তিনি দেখেছিলেন।

এ ভদ্রলোকের তখন সবে কপাল খুলছে। দস্তুরমত আপিস টাপিস খুলে ইনি সবে বসছেন। এক ঘোড়ায় টানা একখানা পাল্কিগাড়ী, যাকে কম্পাসের গাড়ী বলে, তাই কিনেছেন। মাসীর বাড়ী যাওয়া আসা কমে গেছে। আমি পনেরো পার হয়ে ষোলতে পড়েছি। পড়ছি সেকেণ্ড ক্লাসে মানে ক্লাস নাইনে। মাসীর পাহারায় থাকি। ইস্কুলে মাসী বাড়ীতে মাসী পথে মাসী। তবু মাসীর সন্দেহ যায় না। মাসী হঠাৎ আমার জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। আগেই বলেছি আমি তখন ষোলতে পা দিয়ে ষোড়শী হয়েছি। দাঁত দুটি উঁচু বলে এমনিতেই দেখনহাসি কিম্বা সুহাসিনী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ছবি বলে মনে হতে লেগেছে। ওদিকে রত্না মাসী তিরিশে পা দিয়েছেন এবং কোন্ কারণে জানি না মনের দারুণ অশান্তি সত্ত্বেও দস্তুরমত মোটা হতে শুরু করেছেন। সুতরাং 'তন্বী-শ্যামা শিখরিদশনা' আমাকে দেখে যদি মাসী ঘাবড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তার জন্যে কোন দোষ তাঁকে কেউই দিতে পারবে না। ঠাকুরজামাই, রত্না মাসীকে সেজন্যে অর্থাৎ আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হওয়ায় আমি দোষী মনে করিনে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। কেন ঘাবড়ে গেলাম তা বুঝি নি। তবে ঘাবড়ে গিছলাম এটা ঠিক কথা। প্রস্তাবটা শুনে মনে হয়েছিল, মাসী আমাকে বিচিত্র পন্থায় যাবজ্জীবন দীপান্তর বা কারাদণ্ডের মত একটা দণ্ড দিতে চাইছে।

সুতরাং আমি বলেছিলাম—না।

মাসী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ এবং তীর্যক দৃষ্টিতে আমার অন্তর ভেদ করে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কেন?

উত্তর তো ছিল না, সুতরাং চুপ করে ছিলাম।

মাসী গর্জন করে উঠেছিল—'বল'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—'বল। কেন বিয়ে করবে না সেটা বলতে হবে তো। বল'।

আমি এবার সাহস সঞ্চয় করে বলেছিলাম—বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবে না? কেন?

—তুমিও তো বিয়ে কর নি।

—না। করি নি। তার কারণ আছে—। তুমি বিয়ে করবে না, তার কারণটা কি? বল?

উত্তর আর চালিয়ে যেতে পারি নি, সুতরাং মাসী বিজয়িনীর মত বলেছিলেন—যাও, পড়াশুনা কর গে। যা করবার সে আমি করব। বাঁদরামি, পাকামি।

ঠিক সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমার না-দেওয়া জবাবটা দিলেন উনি। অর্থাৎ মাসীর প্রিয়তম বন্ধু। অমৃতবাবু তখন আসাযাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে রত্নমালার প্রতি তাঁর বিরক্তির চিহ্ন। কিন্তু ঠিক সেইদিনই এলেন তিনি। তিনি সমস্ত শুনে বললেন—

না। ওর অমতে কেন বিয়ে দেবে তুমি? ওর বাপ আমাকে বলেছিলেন—দেখ, ওকে পড়িয়ো। মনটাকে তৈরী করে দিয়ো।

মাসী বলে উঠেছিল—না। লেখাপড়া শিখে কি হবে? এই তো আমার মত হবে। না। তা আমি হ'তে দেব না। মেয়েদের চাকরী করে খাওয়ার মধ্যে গৌরব হয়তো অনেক-অনেক কিন্তু তার মধ্যে শান্তিও নেই সুখও নেই। আমি মানি না।

উনি—অর্থাৎ অমৃতবাবু বলেছিলেন—

মণি বউদি বলেছিলেন—আশ্চর্য শান্তভাবে এবং তার থেকেও আশ্চর্যতর দৃঢ়তা ছিল ওঁর শান্ত ভাবটির মধ্যে। উনি (অমৃতবাবু) বলেছিলেন—সে তুমি মানো বা না-মানো তাতে কিছুই আসছে যাচ্ছে না রত্না। এক্ষেত্রে যা মানতে হবে সেটা হ'ল ওর বাপের অন্তিম ইচ্ছা এবং ওর নিজের অন্তরের বাসনা। অবশ্য তার সঙ্গে ওর যোগ্যতাও বিচার্য নিশ্চয়। এ তিনটিই কিন্তু তোমার মতকে সমর্থন করে না। এরপর সব থেকে যেটা বড় কথা সেটা হ'ল —মেয়েটি কারুর পোষ্য নয়। কাছে থাকলেও তোমাকে ওর জন্যে অর্থব্যয় করতে হয় না। ওর বাপ যে টাকা রেখে গেছেন—ক্যাশ সার্টিফিকেট রেখে গেছেন—ওর মায়ের যা গহনা আছে, তাতে ও কারুর দয়ার উপর নির্ভর করে না। ওর মজুত টাকা থেকে প্রতি মাসে তুমি টাকা নাও।

মাসী চীৎকার করে উঠেছিলেন—সে ওর মা থাকলে তাকেও এই টাকা থেকেই খরচ করতে হ'ত। সে রোজগার ক'রে আনত না।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—সেক্ষেত্রে টাকাটায় মায়ের অধিকার থাকত। মা আর মাসী ঠিক সমান কথা নয়।

মাসী আবার বলে উঠেছিল—অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠেছিল—ভাল কথা, তুমি কি ক'রে বাধা দাও আমি দেখব। বিয়ে দিয়ে ওকে আমি বিদায় করব, তবে আমি রত্নমালা।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—শোন, তাহলে বলি। তা করতে চাইলে আমি কোর্টে গিয়ে দরখাস্ত করব, বলব—ওর বাপের শেষ ইচ্ছা আমি বহন করছি এই অধিকারে আদালতে আশ্রয় নিচ্ছি। ওর বাপের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ীই আমি ওকে ওর মাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি মাসী মেয়েটির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ওর বাপের শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। সুতরাং মেয়েটির স্বাধীন ইচ্ছা পড়াশুনা করা, এবং বাপেরও সেই অন্তিম ইচ্ছা যাতে পালিত ও পূর্ণ হতে পারে তার জন্য এই বিরুদ্ধবাদিনী মাসীর কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে কোন নিরাপদ হোম বা বোর্ডিংহাউসে বা রেসিডেনসিয়াল ইস্কুলে তাকে রাখার অর্ডার হোক এবং তার পৈতৃক টাকা গহনা ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদি কোন এ্যাটর্নির হাতে দিয়ে তাঁকেই আইনসম্মত গার্জেন-নিযুক্ত করা হোক।

এক নিশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন অমৃতবাবু। যেন মনে মনে সমস্ত কথাগুলো ফেঁদে মকশো

করে এসেছিলেন।

শুনে রত্নামাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল—চোখদুটো নিষ্পলক—চোখের তারা দুটোতে যেন একটা ঝক্‌মকানি খেলে যাচ্ছিল।

মণিবউদি বললেন—আমাকে নিয়ে মাসীর সঙ্গে ওঁর ঝগড়া সেই নতুন নয়। বারো বছরে এসেছিলাম—এখন পনেরো পার হয়ে ষোলতে পড়েছি। চার বছর গেছে। ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে—ওর কাছে এসে পৌঁছুনোর ঠিক পরদিন থেকে। কিন্তু কখনও রত্না মাসীকে হারতে দেখি নি। উনিও (অমৃতবাবু) কখনও বান্ধবীকে অর্থাৎ আমার মাসীকে এমন ক'রে হার মানান নি। ঝগড়া শুরু করে একটা জায়গায় এসে মাসীকে কৌশলে নিরস্ত্র এবং নিরস্ত্র দুইই ক'রে মুখে নিজে হার মেনে নিতেন এবং নিতেন প্রেমিকের মতই সহাস্য আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে—বলতেন—বেশ-বেশ তাই, তাই হ'ল গো। আমি হার স্বীকার করছি। তুমি যা করবে তাই হবে। তবে তোমার সাম্রাজ্যে এ অধীন অনুগৃহীত জন বলতে চায় যে, আমার বাক্যদানের কথাটা স্মরণ করো। আমার যুক্তিটা ভেবে দেখ।

মাসী হেসে ফেলে বলতেন—খুব যাহোক তুমি!

সে-দিনই হ'ল প্রথম, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম। উনি ওই কঠিন কথাগুলি বলেই উঠে চলে গেলেন। নিজের তরফ থেকে আপোসের চেষ্টা করা দূরে-থাক, মাসীকেও তার নিজের হাতে রান্নাকরা চড়ানুন তরকারিটাতে খানিকটা গুড় মিশিয়ে মুখে দেবার মত করে নেবার অবকাশ দিলেন না।

আমি মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলাম ঠাকুরজামাই। মুখে আমার হাসির রেখা ফুটেছিল। হঠাৎ সশব্দ পদক্ষেপে মাসী গোটা বাড়ীটাকে চমকে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঠাস-ঠাস করে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিলেন। একটা গালে, একটা মুখের ওপর কপালে আর একটা মাথায়। বললেন—কে ওকে এসব খবর দিলে? কে? আজ সকালে কথা হয়েছে—আজই এসেছে। অথচ এ বাড়ী মাড়ানো ছেড়েছে। হঠাৎ আজই কেন এল বল্? বল্? বল্? কে খবর দিয়েছে বল্?

সাত

মণি-বউদি কথা বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ফেললেন। বেশ বিচিত্র হাসি-মুখেই আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সে তাকানো এমন যে আমি অস্বস্তি অনুভব না করে পারলাম না। অথচ এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি এ পর্যন্ত এতটুকু সঙ্কোচের কোন হেতু পাইনি। মণি-বউদির ঠোঁটের সেই বিচিত্র হাসি যেন অল্পে-অল্পে বেড়ে চলেছিল কোন সবিশেষ কারণে।

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—কি হল?

গভীর কোন ভাবনা না-হোক ভাবরসের আস্বাদনের মধ্যে বউদি যেন মগ্ন হয়ে ছিলেন;

প্রশ্নটা এক ডাকে ঠিক সাড়া জাগালে না। দ্বিতীয়বারে একটু চকিত হয়ে উঠে সাড়া দিলেন —এঁ্যা ?

বললাম—থামলেন যে ? কি হল ? এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন ?

এবার, ফিক্ করে হাসা যাকে বলে, সেই ফিক্ করে হেসে বউদি বললেন, নারী পুরুষের সম্পর্কের কথা ভাবছিলাম। সংসারে কার্যের পিছনে কারণ থাকে। সে কারণের মূল ধরে এগিয়ে গভীরে গেলে আদ্যা প্রকৃতির সেই উষ্ণ প্রস্রবণে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও বোঝা কিছু যায় না তবে তার জিজ্ঞাসা থাকে না, বোবা হয়ে যায়।

মানে বুঝি নি। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বউদি বললেন—মাসী সেদিন আমার গালে মুখে ক্রোধবশে চপেটাঘাত করেছিলেন, আঘাতগুলো আমার মুখে কিন্তু ঠিক পড়েনি ; বলতে গেলে মাসীই নিজের গালে-মুখে চড় মেরেছিলেন। এবং প্রশ্ন করেছিলেন, কি করে জানলে ? কে জানালে ? বল। কে জানালে বল ? এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন সে মুহূর্তে আমি জানতাম না। কল্পনাও করতে পারিনি যে এ বিশ্বসংসারে এমন দরদী আমার কেউ আছে যে আমার দুঃখ সইতে না পেরে তা অমৃতবাবুর কাছ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করে দিয়ে আসবে।

আমি ভেবেছিলাম বা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম যে, কাকতালীয় ন্যায় অনুযায়ী তিনি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এসে পড়েছিলেন সেদিন ; কিন্তু না। তা নয়, তিনি মাসীর সন্দেহমত খবর পেয়েই এসেছিলেন। খবর সত্যিই একজন তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। প্রকৃতির রাজ্যে বাতাস যেমন ফুলের গন্ধ মৌমাছিকে পৌঁছে দেয়, অনেকটা সেইভাবে পৌঁছেছিল।

মাসীর বাড়ীতে ছিল এক প্রৌঢ়া ঝি, আর এক ছোঁড়া চাকর। বয়স তখন তার তের কি চৌদ্দ, তার বেশী নয় ; বছর চারেক আগে যখন মণি-বউদি এ বাড়ীতে প্রথম আসেন তখন ছেলেটা ছিল ন'-দশ বছরের। নিতান্ত অনুগত ভালোমানুষ চাকর। 'সাত চড়েও রা কাড়ে না' বলে একটা কথার কথা প্রচলিত আছে, সেটা আশ্চর্যরকমে সত্যি ছিল এই চাকরটার বেলা। ছেলেটা কানে একটু খাটো ছিল, তারই জন্যে মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকত। একটা কথা অন্ততঃ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করলে পর তবে সে তার জবাব দিত। একটু বোকাগোছের দেখেই রত্নামাসী ছোঁড়াটাকে রেখেছিল। মাইনে কম দিত। এঁটো—কাঁটা যা থাকত তার কিছুই ফেলতে দিত না। মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় চুষেই ক্ষান্ত হত না, চিবিয়ে চুর করে ছাড়ত। সেই ছোঁড়াটা তখন চার বছরে বেড়ে চৌদ্দ কম্‌প্লিট করে পনেরোতে পড়েছে। আমার একটু অনুগত হয়ে পড়েছিল।

কাজে-কর্মের মধ্যে ফাঁক পেলেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি বলত, কোন কাজ করতে হবে দিদিমণি।

ছোঁড়াটার তখন বোকা ভাবটা কিছুটা কেটেছে বয়সের সঙ্গে, না হলে, বুঝতেই পারছেন, চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করত না।

জানিয়ে এসেছিল সেই ছোঁড়াটা। নাম ছিল 'পর্‌সাদ'; কি পরসাদ তাও কেউ কোন দিন জিজ্ঞাসা করেনি, তবে শুধু প্রসাদ তো হয় না, হয় রাম, নয় শিব, কালী, দুর্গা, বা দেব বা দেবী কোন একটা শব্দের প্রসাদ হতেই হয়, কিন্তু সেটা কেউ জানত না।

আমাকে সেদিন বিয়ের কথা নিয়ে মাসী যে লাঞ্ছনা করেছিল, সেটা তার চৌদ্দ-পনের বছরের নবীন মনটিকে বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। খবরটা সেদিন সে-ই গিয়ে দিয়ে এসেছিল অমৃতবাবুর কাছে। বেশ ভঙ্গি করে, কণ্ঠস্বরে সেই চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেটির বেদনার্ত কণ্ঠস্বরের আমেজ নকল করে, মণি-বউদি বলেছিলেন, পরসাদ বলেছিল, বহৎ দুখ দেতি হ্যায় মাইজী। ব-হ-ত্। দিদিমণিকে এমুন করে বক্‌লে—। দিদিমণির ব-হ-ত দুখ লাগল। দোনো আঁখে পানি আয়া।

একটু চুপ করে থেকে মণি-বউদি বললেন, প্রসাদ আছে, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। আমাদের ফায়ার-ব্রিক্‌স ফায়ার-ক্লের ওখানে একটা বেশ দোকান করেছে। কিছু ফায়ার-ক্লে কেটে সাপ্লাই-এর কারবারও করে। বোকা আর নয়। আমিই তাকে দোকান-টোকান করে দিয়েছি। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত প্রসাদ আমাদের কাছেই ছিল।

আবার একটু চুপ করে থেকে যেন ভেবেটেবে নিয়ে বউদি বললেন, আপনাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কেষ্টা, রাজারাণীর শঙ্কর, শরৎবাবুর বেহারী, অনুরূপাদেবীর মথ্‌রো—এরা অমর চরিত্র। চাকর হয়েও সত্যিকার মানুষ, চাকরত্বের যে নিচু-তলা, সে তলা ছাড়িয়ে তারা বড় হয়ে উঠেছে। প্রসাদও আমার তাই। অনেকটা তাই। আবার তফাৎও অনেকটা। হয়তো বা—।

চুপ করে গেলেন আবার। মনে হল যেন মনে-মনে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখের চাউনির মধ্যে যেন অন্যমনস্কতা, সেই অন্যমনস্কতাই কথা জুগিয়ে ছিচ্ছিল। হঠাৎ বললেন—মানে—।

কি বলব? আবারও একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবার যেদিন আসবে, সেদিন আপনাকে খবর দেব। নিশ্চয় আসবেন। কারণ খুশী হবেন। সত্যিকারের একটা মানুষকে দেখবেন। এই লম্বা। কালো কষ্টিপাথরে গড়া চেহারা। চল্লিশ ইঞ্চি বুকের পাটা, কোমরটা আটাশ-তিরিশের বেশী নয়। অসাধারণ সাহস, সহ্যশক্তি। আর খুব ভালো গোলাপ ফোটাতে পারে। ওই কারখানার এলাকায় একটা ছোট বাংলোবাড়ী করেছে এখন; এখন তো তার অবস্থা ভাল, সেখানে বাগান করেছে। চমৎকার বাগান। চমৎকার ফুল। বিশেষ করে গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলা আর চামেলী। যখন এখানে আসে তখন ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসে। আগে তো নিয়মিত পাঠাতো সে রোজ। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বন্ধ করেছি।

আপনি নিশ্চয় জানেন, কানে আপনার নিশ্চয় এসেছে যে, মণিমালা মুখার্জী, মিসেস এ মুকুরজীর চালচলন সন্দেহজনক। সেটা দুপুরে এইভাবে সাধুসন্ন্যাসী গণৎকার দেবতাস্থান বেড়ানোর জন্যেই শুধু নয়। আর নাকি অনেক কারণ আছে যা অত্যন্ত কদর্য। তার প্রথম

কারণ আমার বয়স আর আপনার ছেলের বয়সের তফাৎ ; আমার দেখনহাসি এই চেহারা এবং আমার হাসিখুশী ; তাছাড়া উলসিত বিলসিত চরিত্র এবং বি-এ ডিগ্রির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সেই অসামঞ্জস্য দোষ আর তার সঙ্গে ওই পরসাদের ফুলের রাশির উপঢৌকন—সোনায় সঙ্গে সোহাগার মত জুটে গেছে।

আমার মুখে বোধ করি কোন ভাবান্তরের চিহ্ন দেখেছিলেন মণি-বউদি। তিনি বললেন—থাক, কথাটা বেশী আড়ম্বর করে নাটুকে ভঙ্গিতে বলব না ; সোজা রাস্তায়, সাদামাটা ভাবে সত্য কথাটা বলি আপনাকে। আপনার মুখে লাল ছোপ ধরেছে ; আমার জন্যে হয় আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, নয় অস্বস্তি, অশান্তি ভোগ করছেন।

মণি-বউদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার মাসীই আমার গায়ে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল প্রথম। আমার জীবনের কলঙ্ক সেই যে চন্দ্রগ্রহণের মত লাগল, ওর আর মোক্ষ হল না কোনদিন। সেদিন মাসীর সঙ্গে অমৃতবাবুর কথাবার্তায় তপ্ত খোলায় ধান থেকে খই ফুটল এবং মাসী আমাকে চড় মেরে জিজ্ঞাসা করলে—ওকে কে খবর দিলে বল, সেদিন সে-প্রশ্নের উত্তর আমিও দিতে পারলাম না, তিনিও বের করতে পারলেন না। কিন্তু বছর দুই পর মাসীই প্রথম বের করলেন যে, খবরটা দিয়ে এসেছিল ওই বোবার মত ইডিয়ট পরসাদ। এবং তার অন্তর্নিহিত কারণ আমার প্রতি অন্ধ অবুঝ উন্মাদ কামনা।

হেসে আবার বললেন, এসব শব্দগুলো বেশ ভেবে বেছে, বাছাই করে প্রয়োগ করছি, নইলে প্রথম যেদিন মাসী এ অপবাদ দিলে, সেদিন ওই সংস্কৃতিবান ঘরের লেখাপড়া-জানা পেশায়-শিক্ষিকা মেয়েটি সোজাসুজি যে ভাষা প্রয়োগ করেছিল, সে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। 'পিরীত' 'ছেনাল' শব্দ দুটো সেদিন তার মুখ থেকে নিরাপদে ঘরের ভেতরে সাপ বের হওয়ার মত বের হয়ে এল। আমি প্রথম দিনটায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মাসীর মুখ আরও খুলল, তার ধারালো জিভ আরও খেলতে লাগল। এবং ওই সব শব্দের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

ওদিকে অমৃতবাবুর সঙ্গে মাসীর ঝগড়া বাড়তে লাগল।

একটা কিছু হলেই অমৃতবাবু ঠিক খবরটি পেয়ে যেতেন। এ-বেলা হলে ও-বেলায়, রাত্রে হলে পরদিন সকালে।

এরই মধ্যে আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল। ইস্কুল থেকে ছুটি পেলাম। ইস্কুল যেতে হত না আমাকে, কিন্তু মাসীকে যেতে হত। আমি বাড়ীতে থাকতাম। কিছুদিন যেন বেঁচে গিছলাম।

মাসীর তখন সন্দেহের বীজ থেকে অঙ্কুর কেন, গাছ হয়েছে। মাসীর সন্দেহ ছিল অমৃতবাবু আমার ষোল বছরের যৌবন ও রূপের আগুনে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয়েছেন। ভাবতেন মাসী নিজে লণ্ঠনের কানুসের মত আমার রূপযৌবন শিখাকে ঘিরে রেখেছেন তাই রক্ষে, নইলে এতদিন কবে অমৃতবাবু ঝপ্ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজে পুড়তেন এবং আমার শিখাকেও নিভিয়ে দিতেন। এবং পোকা পোড়ার কদর্য গন্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে

কলঙ্কের গন্ধে ভরে দিত।

এবার যখন ফানুসরূপিণী মাসীকে আমাকে একলা রেখে ইস্কুলে যেতে হল, আমি একলা বাড়ীতে থাকতে লাগলাম, তখন তাঁর উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের আর সীমা রইল না। দিন আট-দশ বেশ শান্তিতে কেটেছিল। তারপরই মাসী জিনিস ফেলে যেতে লাগলেন। ইস্কুল থেকে রিক্‌শা করে এসে হাজির হতেন। এবং দরজায় ধাক্কা মেরে শোরগোল তুলে সেই দুপুরবেলায় গোটা পাড়াটাকেই চঞ্চল এবং চকিত করে তুলতেন। প্রথম কয়েক দিন লোক কিছু চকিত হয়েছিল চীৎকারের জন্যে, কিন্তু দুতিনদিন পর থেকে বিষয়বস্তুর মধ্যে কলঙ্কের স্বাদ পেয়ে তারা উল্লসিত কৌতূহলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত মাসীর উত্তপ্ত উচ্চ কণ্ঠ-স্বরের জন্য। তারপর ক্রমে ক্রমে এতেও মন্দা পড়ল, কারণ স্বাদটা পুরনো একঘেয়ে হয়ে আর তেমন রুচিকর রইল না।

অন্যদিকে মাসী যেন তাঁর দিক থেকে জোর হারাচ্ছিলেন। আমাকে ঠিক হাতেনাতে ধরতে পারছিলেন না। এবং এই অন্যদিকের অন্যদিকে অনুভব করছিলেন, যে-অমৃতবাবু তাঁর কৈশোর-যৌবনের বন্ধু, তিনি তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।

মানুষটা তখন বিষয়-ব্যাপার নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। ব্যবসায়ে আয় হচ্ছে। ভাল আয়। আয়কর বিভাগের আওতায় গিয়ে পড়েছেন। আমার ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে তিনি ঠিক করে ফেললেন, আমার পরীক্ষার ফল বের হলেই আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কোন বোর্ডিংহাউসে। আমি সেখানেই থাকব। মাসীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর আমার থাকবে না।

আমি তখন সপ্তদশী। সতেরোতে পা দিচ্ছি।

মনে মনে, যেন উনোনে-চড়ানো কড়ায় টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছি।

নিশ্চয় বুঝেছেন কথাটা।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন মণি-বউদি।

তারপর বললেন, দুদিনের দুটো কথা বলি আপনাকে। বেহায়া হয়তো ভাববেন। তা ভাবুন। বেহায়া আমাকে করে দিয়ে গিয়েছে আমার মাসী। আমার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়, প্রত্যেক চাউনিতে সে বেহায়াপনা দেখতে পেত এবং তার জন্যে আমার লাঞ্ছনার বাকি রাখত না। আমার জীবনের সব কিছুতেই, চাউনি, চলাফেরা, হাসি-কান্নাতেও আমার অজ্ঞাত বেহায়াপনা আবিষ্কার করে ওই—'পিরীত', 'ছেনালি' গোছের অজস্র কথা আমাকে শুনিয়ে শিখিয়ে পাকা বেহায়া করে তুলেছিল।

ঠাকুরজামাই, বেশ্যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে? তাদের বেহায়াপনা দেখেছেন? তাদের মুখে অশ্লীল কথা শুনেছেন? কণ্ঠস্বর তাঁর শক্ত এবং ঝাঁঝালো হয়ে উঠল।

বললেন, শোনেন নি বললে বিশ্বাস করব না। আপনি বিব্রত হবেন না. আপনার কাছে কনফেসন আদায় করছি নে। বলছি তাদের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, ওই অশ্লীল শব্দগুলো এবং খারাপ খারাপ ইমেজগুলো মানুষের মনে জন্মদোষে বা আপনা-আপনি, ফাল্গুনের

শেষের পাতাঝরা ডাল-ভরা পলাশ-শিমুলের মত ফোটে না। ওগুলোকে চাষ-আবাদ করে ফলাতে হয়। ভদ্রঘরের বউ বা মেয়ে যখন ওপাড়ায় ওদের বাড়ী গিয়ে পড়ে, তখন ওই শব্দ আর ওই ভাব-ভাবনাগুলো হাসির মধ্যে, রাগের মধ্যে, চেঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার কানে ঢুকিয়ে দেয়।

বলতে বলতে মণি-বউদি পাল্টালেন।

হাস্য-রহস্য-কৌতুকময়ী মেয়েটি যেন শক্ত কঠিন সোজা কোন ইস্পাতের ধারালো অস্ত্রের মত ঝকমকে হয়ে উঠলেন। চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা ফুটল। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, নিজেও যেন শক্ত হয়ে উঠলেন।

আরও একটি কথা বলে নিই এইখানে। মণি-বউদির এ কথা তো আজকের কথা নয়। পঁচিশ বছরের বেশী আগের কথা। সুতরাং মণি-বউদির সংলাপ যা বসিয়েছি তা ঠিক মণি-বউদির শ্রীমতী-মুখ-নিঃসৃত অবিকল কথাগুলি নয়। তবে তার সঙ্গে ভাবভঙ্গিতে মিল আছে। মণি-বউদি বি-এ পাশকরা মেয়ে এবং ব্রাহ্ম বাপ ও মাসীর কাছে মানুষ। এ-মেয়ে যে-কালেরই হোন এ-মেয়েরা দীপ্তিমতীই হয়ে থাকেন। অর্থাৎ জীবনে যেভাবে যেদিকেই মুখ ফেরান বা ফিরে তাকান একটা ঝকমকানি থাকে। সে হাসিতেও বটে, কথাতেও বটে, রসিকতাতেও বটে, এমনকি কান্নাতেও বটে। সেই কথা মনে রেখেই মোটামুটি, সেই ১৯৪২ সালের আগস্টের শেষ বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে এক শুক্লপক্ষের রাত্রে তাঁর কাছে শোনা তাঁর কথাগুলিকে আমার ভাষাতেই প্রকাশ করেছি। তবে এমনি ধরনের একটা তীর্যক ভঙ্গিতেই সে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন। কিন্তু এই যে শেষের কয়েকটা, সেখানে কৌতুকময়ী মনোরমা মণি-বউদি অকস্মাৎ শক্ত এবং সোজা ইস্পাতের কোন ধারালো অস্ত্রের মত হয়ে উঠে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো আমার ভালভাবে মনে আছে। কারণ, কথাটা শেষ করেছিলেন একটা গল্প বলে।

বলেছিলেন, একটা গল্প শুনেছিলাম বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের ঠাকুরবাড়ীতে পণ্ডিতজীর কাছে। এক ব্যাধ বন থেকে দুটো ময়নার বাচ্চা এনেছিল এবং একটা বিক্রী করেছিল এক ব্রাহ্মণকে, আর একটা বিক্রী করেছিল এক ব্রাত্যকে। (এখানে তিনি একটা জাতের নাম করেছিলেন।) বামুনের বাড়ীরটা বড় হয়ে উঠে ভোর থেকেই শুরু করত—কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণরাধা। সীতারাম, সীতারাম। লোক দেখলে বলত—আসুন, আসুন। আর ব্রাত্যের বাড়ীরটা সকাল থেকেই শুরু করত অশ্লীল কথা। কুৎসিত গালাগালি।

এর পরে বলেছিলেন—আমি দুই বাড়ীর সকল বুলিই শিখেছিলাম। পাখী শুধু বুলি বলে, বুলির কোন ভাব তার অন্তরকে দোলা দেয় না, নাড়ায় না, কিন্তু মানুষের মুখে যা বের হয়, বুকের ভেতর থেকেই তার জন্ম হয়। কানে যা ঢোকে, তার মানেটা বুকের ভিতরটায় ভাবের ঢেউ তুলে আছাড় খেয়ে পড়ে।

ঠাকুরজামাই, সতের বছর বয়সে তখন সবই শিখেছি। কানে আর তখন কথাগুলো খুব

কটু ঠেকে না। খুব ঝাল-তরকারি খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেলে যেমন নামেই ভিজে জল আসে এবং খেয়ে পেট-মুখ জ্বললেও মনে হয় আরও খাই, না খেতে পেলেই যেমন সবকিছুতে অরুচি ধরে, তেমনি অবস্থা হল আমার। ঠিক এই সময়েই একদিন আবিষ্কার করলাম চারটে বা দুজোড়া লুব্ধ দৃষ্টি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

একজোড়া চোখ অমৃতবাবুর, অন্য জোড়া ওই ছোকরা চাকর পরসাদের।

শুধু আমি দেখলাম না। সে হলে আজ আমিই আপনাকে বলতাম—ঠাকুরজামাই, ঠিক বলতে পারছি না ভাই, লোভটা তাদের না আমার নিজস্ব মনের? আয়নাতে ছাপ পড়ার মত ছাপ পড়েছিল। দাঁড়ান, আগের কথাটা বলে নিই।

* * *

এরই মধ্যে, মানে, ঠিক আমার পরীক্ষার ফল বের হবার প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

অবশ্য অমৃতবাবু চেষ্টা করে আমার পাশের খবরটা আগেই জেনেছেন ও জানিয়েছেন। আমি তখন খুব খুশী। বেশ হেসেই অমৃতবাবুর সঙ্গে কথা বলি, আবদার করি। এবং আরও সূক্ষ্ম তীর্যক ভঙ্গিতে পরসাদের দিকে তাকিয়ে হাসি। তখন একদিন চুরি হয়ে গেল মাসীর বাড়ীতে।

আট

এবার মণি বউদির কথা আমার জবানীতে বলছি—

মণিবউদির মাসীর বাড়ীতে হঠাৎ চুরি হয়ে গেল। তাতে যা গেল তা সবই গেল মণি-বউদির। রত্নমালা-মাসীর গয়নাগাঁটি বিশেষ ছিল না। ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তাঁর গয়নার উপর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না; থাকবার মধ্যে প্লেন বালা, কানের টাপ, গলার হার আর একটা হাতঘড়ি। সে সবের মধ্যে হাতঘড়িটা ছিল বালিশের তলায়, বাকী যা কিছু তা ছিল গায়ে। সে সবে তারা হাত দেয় নি। তারা ঘরের কোণে একটা লোহার সেফ ছিল সেটা বিচিত্র কোন কৌশলে খুলে তার ভিতর থেকে নিয়ে গিয়েছিল দামী এবং মজবুত একটা ষ্টিলের ক্যাশবাক্স। তার মধ্যে ছিল মণিমালার মায়ের গহনা, মণিমালারও বাড়তি বা তোলা গহনা যাকে বলে তাই কয়েকখানা, আর তার বাপের কেনা ক্যাশ সার্টিফিকেট।

মণি বউদি বলেছিলেন, বলতে ভুলে গেছি, আয়রণ সেফটা সমেত গয়নার বাক্স উনি নিয়ে এসেছিলেন পাটনা থেকে আমারই সঙ্গে। আমাকে এনে তুলে দিলেন মাসীর বাড়ী, তাই ওই আয়রণ সেফ সমেত ক্যাশবাক্সটাও এসে উঠেছিল মাসীর বাড়ী। চাবি কয়েকটা প্রথম ওঁর কাছেই থাকত, তারপর এসেছিল মাসীর হাতে।

কলকাতায় এই ধরনের চুরি আশ্চর্য চুরি হলেও বছরে অনেক কয়েকটা ঘটে, বাইরে থেকে ভিতরের ছিটকিনি হুড়কো খিল খুলে তারা ঘরে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে বা টর্চ

জেলে বাক্স-পেঁটরা বের করে নিয়ে চলে যায়, ঘরের মানুষেরা ঘরে অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে; কোনক্রমেই লোকজনের চলাফেরায় বা জিনিসপত্র সরানোর শব্দে তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় না। এ সেই ধরনের চুরি।

সিন্দুক খুলে ক্যাশবাক্সটা এবং চৌকির ওপর রাখা গোটা দুই ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে গেছে। কোন প্রকারের কোন নিশানা রেখে যায়নি। নিশানার মধ্যে পাওয়া গেল পরিত্যক্ত ভাঙা বাক্স কয়েকটা: বাড়ীর ঠিক পিছনেই জমাদার যাতায়াতের গলির মধ্যে। ভিতরের বস্তুগুলির কোন সন্ধানই কোন সূত্রে পুলিশ আবিষ্কার করতে পারলে না। আবিষ্কার করবার জন্য ধরে নিয়ে গেল পরসাদ অর্থাৎ ছোকরা চাকরটাকে: বোকা সরল পরসাদ তখন কৈশোর পার হবো-হবো করছে; তার চোখের দৃষ্টি বদলের কথা আপনাকে বলেছি, সম্ভবতঃ সেই নতুন-রকম দৃষ্টি দেখেই তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল, বলে গেল, ছেলেটার রকম-সকম খুব সাস-পিসাস, ওকে নেড়ে দেখতে হবে। আর বাড়ীর লোক ভিতর থেকে খবর না-দিয়ে থাকলে এ চুরি হয় না।

প্রায় মাস দুয়েক ধরে নাড়া খেয়েছিল পরসাদ এবং লছমন পরসাদ ছাড়াও আরও কিছু-লোকও নাড়া খেয়েছিল; রেহাই পায় নি।

মণিবউদি বললেন—সে আমার মাসী থেকে আপনার দাদা পর্যন্ত। মাসীর বাড়ীতে থাকত একটা ঝি, সে তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম করলে। মাসীকে অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করত বাড়ীতে এসে; আমাকেও বাদ দেয় নি; আমাকেও জিজ্ঞাসা করত। যখন জিজ্ঞাসা করত তখন আমার ভয় হত, মনে হত হয়ত আমাকেই জেলে ধরে নিয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করত কি জানেন, জিজ্ঞাসা করত কাকে-কাকে তুমি তোমার মায়ের গয়নার কথা বলেছ? মনে কর তো? কোন মেয়েবন্ধুকে বল নি? কোন মেয়েবন্ধুর ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ নেই? ওই পরসাদ ছোঁড়াটাকে বল নি যে, তোমার মায়ের গয়না টাকাগুলো পেলে তুমি মাসীর কাছ থেকে গিয়ে বাঁচতে? বলতে না?

আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। আমারই যখন এই অবস্থা তখন মাসীর এবং মাসীর ঝি'র অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ঝিটা থানা থেকে এসে ডাক-ছেড়ে কাঁদত। আমাকে অভিসম্পাত দিত।

মাসীও তাই। এক-একদিন বলত—আমি বিষ খাব। বিষ খেয়ে মরব। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরব।

অমৃতবাবু এ বাড়ীতে আসতেন না। তাকে সম্মুখে না-পেয়ে উদ্দেশে অভিযোগ করে বলত আমার জীবনের অভিশাপ, আমার কুগ্রহ। ওই কুগ্রহের জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। আজ আমি পথের কুকুরের থেকেও অধম হয়ে গেছি। সারা জীবনটাকে শুকিয়ে ঝরিয়ে পথের ধুলোয় মিথ্যেমিথ্যি মিশিয়ে দিলাম। সাধ আকাঙ্ক্ষা আশা সব কর্পূরের মত কোন দিকে উবে গেল। এঁটো পাতার মত অবস্থা আমার। ওই একটা লোকের জন্যে। ওই লোকটা।

অর্থাৎ অমৃতবাবু।

বউদি অর্থাৎ মণিমালা-বউদি হেসে বললেন—আর আমার সম্পর্কে যা বলতেন, যে-শাপ-শাপান্ত দিতেন, তার কথা ঠিক বলে প্রকাশ করতে পারব না ঠাকুরজামাই। কারণ ময়রার বাড়া তো গাল নেই। শাস্তিও নেই। কখনও কখনও নানান রোগ হোক বলে শাপ-শাপান্ত করে কেউ-কেউ। আপনার শ্যালকের দেশে মেয়েদের ঝগড়ায় শুনেছি—বলে—চোখের মাথা খেয়ো। একটি একটি করে অঙ্গগুলি পচে-পচে খসে যাক। কিন্তু কথায় তো শাপ নেই নন্দাই, শাপ আছে, কথা বলার কোপের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে। সে জেনুইন—মানে আদি ও অকৃত্রিম না হলে নকল করে আনা যায় না। তবে শেষ যে শাপই বলুন আর বাণই বলুন যেটা নিক্ষেপ করলেন, সেটা এসে সোজা আমার বুকে বিঁধল। এবং গভীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা আমি মরলাম না।

মাসী পুলিশের কাছে বলে বসল, আমার বোনঝি, আমি বলতে ঠিক পারি নি। আমার সন্দেহ হয়—। সন্দেহ হয়—ওই পরসাদ ছোঁড়াটার সঙ্গে ওর—।

কথাটা ঝাল এবং নোন্তা। শুনবা মাত্র জিভে জল আসে; জিভে দেবা মাত্র আরও একটু মুখে দিতে ইচ্ছে করে। পুলিশ কথাটা শক্ত করে ধরে বসল।

আমার গায়ে ছাপ পড়ে গেল।

কলঙ্কের ছাপ।

মণিবউদি হেসে বললেন—সেই প্রথম। সেদিন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম নন্দাই। একেবারে বোবা যাকে বলে তাই। এর কোন জবাব থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও আসে নি। আমি ওই প্রসাদ—ওই চাকরটার সঙ্গে—?

পরসাদকেও এর জন্যে কম নির্যাতন করেনি পুলিশ। পরসাদ পুলিশকে বলেছিল, চুরির কথা সে কিছু জানে না। সে শিউজী মহারাজের মন্দির ছুঁয়ে একথা বলতে পারে। আর মণিদিদি তাকে ভালবাসে কিনা সে জানে না, তবে মণিদিদিকে যেভাবে তার মৌসী দুধ দেয় তাতে তার মনে খুব দুখ লাগে। এবং সে-ই এ সব খবর দিয়ে আসে অমৃতবাবুকে। এর বেশী কিছু নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। সম্বিতের সঙ্গে কথা; কথার সঙ্গে মাসীর অভিযোগের জবাব।

বলে বসলাম—আমার সন্দেহ হয় মাসীই আমার গহনা টাকা চুরি করিয়েছে। এতদিন মাসী বলে চুপ করে ছিলাম। আজ আর চুপ করে থাকব না। কেন থাকব? মাসী অমৃতবাবুকে ভালবেসে বিয়ে করে নি, বাড়ী থেকে চলে এসে চিরকুমারী হয়ে রয়েছে এ তো সবাই জানে। এখন অমৃতবাবু আমাকে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায় সন্দেহ করে আমার গহনা চুরি করিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে চাকরের সঙ্গে কলঙ্ক রটিয়ে দিচ্ছে।

কথাটা মণিমালা বা মণিবউদি ভেবেচিন্তে বলেন নি।

সেদিন অর্থাৎ ১৯৩২ সালে সেদিন রাত্রে আমাকে তাঁর জীবন-কথা বলতে গিয়ে ঠিক এই

কথাটাই বলেছিলেন, আমার বেশ মনে পড়ছে। বলেছিলেন, কথাটা খুব ভেবে-চিন্তে আমি বলি নি নন্দাই ; ছেলেমানুষের ঝগড়ায় একজন অন্যজনকে চোর বললে সে যেমন সঙ্গে-সঙ্গে বলে বসে—কি, আমি চোর? তুই চোর, তুই চোর, তুই চোর। ঠিক তেমনিভাবেই বলেছিলাম কথাটা। বলেছিলাম—আমি যদি পরসাদকে ভালবেসে তাকে দিয়ে আমার গহনা টাকা চুরি করিয়ে পালাতে চেয়ে থাকি, তবে মাসীই বা অমৃতবাবুকে আমার উপর এত সদয় দেখে পরসাদের সঙ্গে জড়িয়ে আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিচ্ছে না, এমনই বা হবে না কেন এবং আমার গহনা ক্যাশ-সার্টিফিকেট চুরি করিয়ে আমাকে সাজা দিতে চাচ্ছে না, এমনই বা নয় কেন? আরও একটা কথা বলে বসলাম। জানি না কেমন করে বলতে পেরেছিলাম। বলে বসলাম, পরসাদকে আমি ভালটাল বাসি নে। আমি ভালবেসে ফেলেছি অমৃতবাবুকে। অমৃতবাবুও আমাকে ভালবাসে। মাসীর রাগ সেইখানে। মাসীই বলুক না বুকে হাত দিয়ে নিজে মুখে সে কতবার এই কথাটা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলেছে। মাসীর ঝিটা, তার নাম ছিল সত্যবালা, সে শুনেছে, সেও এর সাক্ষী ; বলুক না সে। অমৃতবাবু নিজেই বলুন না, তাঁকেও একথা শুনতে হয়েছে কিনা। বলুন উনি।

পুলিশ আমার কথা দিয়ে মাসীকে চার্জ করলে। মাসীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফ্যাকাশে মুখে পুলিশ অফিসারকে বলে ছিল, এই কথা বলেছে মণি?

অফিসারটি বলেছিল, ডেকে মোকাবিলা করে দেব?

বোবা হয়ে গেল মাসী।

অফিসার তবু আমাকে ডেকেছিল, বলেছিল—আমাকে যা বলেছ তা তুমি আবার তোমার মাসীর সামনে বলতে পারবে?

মণিবউদি বললেন—আমি চুপ করে ছিলাম। আমার সাহস মুখোমুখি হয়ে ভেঙে আসছিল। অফিসারটি বললেন—আমাদের খাতা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

মাসী বলছিল, থাক। আমি অমৃতবাবুকে ভালবাসি এ সবাই জানে। অমৃতবাবুই ওকে নিয়ে এসেছে ঘাড়ে করে এও সত্যি। আমি সন্দেহও করি এও সত্যি। অমৃতবাবু ওকে ভালবাসে এও খুব সম্ভব সত্যি ; কিন্তু ও অমৃতবাবুকে ভালবাসে?

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ছিল, কিন্তু চুরির কিছু জানি না আমি।

আমি মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাসীর মুখ যেন ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গিয়েছিল। মড়ার মত মুখ। ঠোঁট দুটো শুকনো মনে হচ্ছিল। চোখের চাউনি যেন বোকার মত, বিহ্বলের মত।

সব থেকে কৌতূহলজনক বা বিস্ময়জনক কি জানেন? সেটা হল অমৃতবাবুর কথা। অমৃতবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল না। অমৃতবাবুর টকটকে ফর্সা রঙ আরও যেন লাল হয়ে উঠল। বয়স তখন তাঁর চল্লিশ। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। তাছাড়া এঁদের বংশে চুল তিরিশের পরই ফিকে হতে শুরু করে ; এঁর আবার একটু বেশী। ফলে বেশ ভারিক্কি ভারিক্কি

দেখায়। তার উপর দেশসেবক ব্রহ্মচারী বলে একটা নামডাক আছে। সেই মানুষটা কেমন যেন বাসরঘরের অল্পবয়সী বরের মত লজ্জিত এবং পুলকিত এবং সুরঞ্জিত হয়ে উঠলেন। এবং স্বীকার করলেন পুলিশ অফিসারের কাছে যে, মণিমালা যা বলেছে তাতে তাঁর প্রসঙ্গ যতটুকু আছে তা, সত্য বলেই তিনি স্বীকার করছেন। হ্যাঁ, মেয়েটির ভার তিনি সস্নেহে নিয়েছিলেন, তার বাপের মৃত্যুশয্যায়। এবং আজ তিনি এতদিন পর স্বীকার করছেন যে, ক্রমে ক্রমে স্নেহ এখন একটি উত্তপ্ত আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। তবে তাকে তিনি প্রাণপণে সংযত রেখে এসেছেন। রত্নমালাই তাকে খুঁচে-খুঁচে ধোঁয়াটে উনোনকে খুঁচিয়ে জ্বালিয়ে তোলার মত প্রজ্বলন্ত করে তুলেছে। এবং মণিমালা যে সন্দেহ করেছে সে সন্দেহকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়েও দিতে পারেন না তিনি। তবে অবশ্য তিনি এ সম্পর্কে নীরবই থাকছেন। কোন মন্তব্যই করছেন না।

সেই দিন রাত্রে রত্নমালা-মাসী অমৃতবাবুকে চিঠি লিখেছিল। প্রিয়তম অমৃত বলে।

মণিবউদি বলেছিলেন, মাসী আমার এর পর চিঠির পর চিঠি লিখেছে; এবেলা লিখেছে ওবেলা লিখেছে। কিন্তু অমৃতবাবু একখানারও উত্তর দেন নি। সে সব চিঠিগুলো আমি সংগ্রহ করে রেখেছি।

—সে সব অনেক চিঠি। মাসীই চিঠি লিখত অমৃতবাবুকে। অমৃতবাবু কিন্তু তাকে কোন উত্তর দিতেন না। প্রথম কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। ওদিকে পুলিশ একটু-একটু করে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং অন্যদিকে আমার নামে অনেক রটনা রটছিল। পাড়াটা মুখর হয়ে উঠল। রটনার সুকৌশলে সপ্তদশী মণিমালা টাগ অব ওয়ারের দড়িতে পরিণত হয়ে গেল, যার একদিকে পরসাদ, অন্যদিকে অমৃতবাবু ধরে টানছেন। এবং ক্রমে-ক্রমে আমার নিজেরও যেন তাই ধারণা হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ হেসে ফেললেন মণিবউদি।

সামনের দাঁতদুটি উঁচু, মণি-বউদির চেহারাই দেখনহাসির মত; এবং সেটুকু তিনি নিজে জানেন, তাই যখন হেসে ফেলেন তখন ডান হাতে রুমাল বা কাপড়ের আঁচল তুলে মুখ মোছার ভান করেন, কখনও অকপটভাবেই মুখে কাপড় চাপা দেন।

হেসে ফেলে আঁচল টেনে চাপা দিয়ে বললেন, আমার কিন্তু বেশ লাগত ঠাকুরজামাই। মনে-মনে গরবিনী-গরবিনী ভাব একটা আমার দেমাক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে আমার ঢঙ বেড়েছিল, ছলাকলা বেড়েছিল। আমি যেন পদ্মপত্রে জলের মত টলমল করে নেচে বেড়াতাম। কথাগুলো আমার নয়। কথাগুলো আমার মাসীর ঝির। ঝিটার নাম ছিল সত্যবালা সে আবার মধ্যে-মধ্যে ছড়া কাটত। অশ্লীলতা ঘেঁষা ছড়া।

আমি মুখ টিপে হাসতাম।

এরই মধ্যে একদিন অমৃতবাবু আমাকে চিঠি লিখলেন। একখানা চিঠি বের করে খুলে ধরে বললেন—আরম্ভ করেছেন 'স্নেহের মণিমালা' সম্বোধন দিয়ে; শুরু করেছেন বেশ—এরপর পড়ে গেলেন, "অনেকদিন হইতে তোমাকে লিখিব-লিখিব করিয়াও লিখিতে পারি

নাই। কোথা হইতে কে বা কি যেন আমার কলম চাপিয়া ধরিত ; লিখিতে পারিতাম না। বিশেষ করিয়া তুমি পুলিশ অফিসার সুরেনবাবুকে যাহা বলিয়াছ, তাহা শুনিয়া অবধি আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, আমার সারাজীবনটাই যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে বদলাইয়া গিয়াছে। আকাশের রঙ বদলাইয়াছে, মাটির চেহারা পাল্টাইয়াছে, বাতাসের স্পর্শ পাল্টাইয়াছে, সারা জীবনের মানে পাল্টাইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে নিজেরই যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি, ইহা মায়া নহে তো ? ইহা ভোজবিদ্যার খেলা নহে তো ? আমি দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি না তো ? ইহা কি সত্য হইতে পারে ? তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ ? আমি যৌবনের প্রায় শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তুমি সদ্যকুসুমিত যৌবনের মাধবীকুঞ্জে মঞ্জু-বিকচ কুসুমপুঞ্জ ; তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ ? ইহা যে আমার স্বপ্নের অতীত। ইহা যে আমি কখনও কল্পনাও করি নাই।"

আবার মুখে কাপড় চাপা দিলেন মণিবউদি। এবং এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—এ যে কত আছে কি বলব আপনাকে ? পাঁচ পৃষ্ঠা চিঠি, মূল্যবান কাগজ, সুন্দর করে লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাতের বাংলা লেখা এত খারাপ যে রীতিমত প্রাচীন-লিপি উদ্ধার করার মত কষ্ট করে পড়তে হয়। কথা কিন্তু ওই একটা বা দুটো, যে যেমন হিসেব করে ধরে আর কি।

ওই—"ইহা কি সত্য ? তুমি আমাকে ভালবাস ?"

পরিশেষে বক্তব্য আছে কিছু। চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। লিখেছেন—"রত্নমালা এখন চাহিতেছে যে, এই চুরির সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি উপরে বলিয়া-কহিয়া চাপা দিয়া দিই। তুমি নিশ্চয় জান যে মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে আমার জানা-শোনা আছে। দুই-চারিজন বন্ধু-বান্ধবও আছেন। স্বয়ং হুকসাহেব আমাকে স্নেহ করেন। আমি বলিলে কথাটা থাকিবে বলিয়া আশা করি। এখন সবই নির্ভর করিতেছে তোমার সম্মতির উপর। তুমি সম্মতি দিলে ব্যাপারটা আমি চাপা দিয়া দিব। রত্নমালা যে হাঙ্গামায় পড়িয়াছে তাহা হইতে সে উদ্ধার পাইবে।

অবশ্য তোমার গহনাগুলি গেল। ক্যাশসার্টিফিকেট উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। গহনার জন্য দুঃখ করিও না। তোমার জন্য বিধাতা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন।

তুমি ইহাতে সম্মতি দিলে আমি ব্যাপারটা চাপা দিব, বিনিময়ে রত্নমালা তোমার এবং আমার জীবন হইতে সরিয়া যাইবে।"

নয়

এই পর্যন্ত ব'লে মণি-বউদি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন ভেবে নিচ্ছিলেন। সেদিন তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আমি এবার একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। গোড়ার দিকটা বেশ ভাল লেগেছিল কিন্তু এতক্ষণ ধরে বলার পর যেন তেমন কোন জমাট কিছু পাই

নি বলে আর ততটা ভাল লাগছিল না।

একটি তিরিশ-উর্ধ্বা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একটি কিশোরী বা সপ্তদশী সদ্যযুবতীর এই দ্বন্দ্ব যতটা কৌতুকজনক হোক না কেন তার থেকেও যেন বেশী বিয়োগান্ত, বেদনাদায়ক। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি মণি-বউদির মাসীর জয় হলেই খুশী হতাম। মণি-বউদির জয় হয়েও তো জয় ঠিক হয় নি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মণি-বউদি নিজে সুখী হন নি। সুখী হবার কথাই যে নয়। একটি সপ্তদশ বসন্তের মালার পক্ষে উপযুক্ত কণ্ঠদেশটির বয়স তিরিশের নিচেই হওয়া উচিত।

আমি উঠে আসতে চাচ্ছিলাম।

মণি-বউদি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন—বললেন—পাড়াগাঁ অঞ্চলে একটা কথা আছে, লোকে বলে—সতীনের হাড়ে মেয়ের জন্ম। তার মানে মায়ের ভাগ্যে মেয়ে হিংসে করে। মায়ের গয়না হলে মায়ের ননদ বা জায়ের হিংসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না কিন্তু মেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যায়—আমার কই? আমার কই? আমি নেব। বাবা মাকে আদর করলেও মেয়ের হিংসে হয়। মেয়ের বিয়ে হলে দিনকতক মা মেতে ওঠে মেয়েকে নিয়ে। ক্ষেত্রবিশেষে মায়েও মেয়ের হিংসে করে বলেই আমার বিশ্বাস ঠাকুর-জামাই। মাসীর কথা তো শুনছেনই। এবং মেয়ের সব থেকে বড় শত্রু পুরুষ নয়, খাদ্যখাদক সম্বন্ধ হলেও নয়; মেয়ের সব থেকে মারাত্মক শত্রু হল মেয়ে।

আমি—; মণি-বউদি বললেন—আমি ওঁর চিঠি পেয়ে মাসীর এই লাঞ্ছনায় এবং তার পরাজয়ে আশ্চর্য রকমের খুশী হয়ে উঠেছিলাম। আজকাল লোকে বলে 'ভীষণ আনন্দ' হয়েছে, তা আমার ক্ষেত্রে সেদিনের সে আনন্দ সত্যি সত্যিই ভীষণ আনন্দই ছিল। সেই ভীষণ আনন্দটুকু আশ্চর্য রকমের রোমান্টিক করে তুলেছিল, আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়—আমার মেসোর বয়সী অমৃতবাবুর ওই বিহ্বল প্রেম-নিবেদন, কি বলব আপনাকে; দুটো আনন্দ মিলিয়ে সে যেন আনন্দের তাল-বেতাল-সিদ্ধির আনন্দ অনুভব করেছিলাম; সর্বাঙ্গে যেন খুশি কানায়-কানায়-ভরা সরোবর-দীঘির মত টলমল করছিল, একটু নড়াচড়া করতে গেলেই উছলে পড়ে চারি পাড় বা চারিপাশকে ভিজিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

এখানেই একবার একটু থেমে আমার মুখের দিকে সঙ্কোচহীন প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বললেন—আপনাকে আজ পরম বন্ধুর মত মনে হচ্ছে নন্দাই—কোন কথা গোপন করব না আপনার কাছে। সেদিন আমি চার পাঁচবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে কটাক্ষ হেনেছি এবং উল্লাসে হেসে প্রায় ভেঙে পড়েছি। বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে একবারও পরসাদের কথা ভাবি নি বা একবারও মনে হয় নি যে, অমৃতবাবু আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়, মাথার চুলে তার পাক ধরেছে এবং সামনের দিকটার চুল বেশ পাতলা হয়ে এসে টাক ফেলছে। অসাধারণ মজা লাগছিল, এতবড় একটা মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে, বোকা হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমানুষির আর শেষ রাখছে না।

থাক। সে সব অনেক কথা। আপনি যদি এই নিয়ে একটা নাটক লেখেন তবে আমার কাছে বসবেন খাতা কলম নিয়ে; আমি বলব আপনি লিখে নেবেন। তারপর মেজেঘষে নিলেই সে যেমন রিয়েল হবে তেমনি সাহিত্যও হবে। এবং নাটকও হবে। একটু থামলেন আবার। একটা চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে এলেই যে ভাবান্তর হয় তাতে এই হঠাৎ ছেদের প্রয়োজন আছে। ইলেকট্রিক পাখার সুইচ অনই করুন বা অফই করুন একটা শব্দ হবেই। ওইটেই ছেদ। একটু থেমে বললেন—কিন্তু মাসীর উপর শোধ নিতে যে কি নিষ্ঠুর হয়েছিলাম তা আজ যখন ভাবি তখন নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। যেমন করে ঈশপের গল্পের ছেলেরা ব্যাঙ নিয়ে খুঁচে খুঁচে আমোদ করেছিল ঠিক তেমনি ভাবে। খুঁচে খুঁচে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। এতটুকু মায়া হয় নি। উল্টে আনন্দ হয়েছিল।

না, ঠাকুর-জামাই, ভুল বললাম। মাসী, আমার ব্যাঙ ছিল না, আমিও ছেলেমানুষের ছেলেমি করি নি। মাসী ছিল আমার সাপ আমি ছিলাম বেজি। না, ঠাকুর-জামাই, ঠিক বলা হল না। বেজীতে সাপে লড়াইয়ে যে হারে সে বেঁচে থাকে না, তাকে মরতে হয়। মাসী শেষ পর্যন্ত মরে নি। আজও তার জন্যে পাগলা গারদের খরচ যোগাচ্ছি। উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। বিশাল একটা মাংসস্তূপ। এ-ই মোটা হয়েছে। এবং—।

বলতে বাধছে মুখে।

জীবনের তার সব চলে গেছে, আছে শুধু জীবনের যা অশ্লীলতা তাই। যত দিন যাচ্ছে তত যেন পচে ফুলে, আয়তনে বাড়ছে।

থাক। এ হল অনেক পরের কথা। সে সময় অমৃতবাবুর পত্র পেয়ে—। পত্রখানা নিয়ে এসেছিল অমৃতবাবুর আরদালী। পত্রখানা দিয়ে বললে—উত্তর নিয়ে যেতে বলেছেন। বাড়ীর বাইরে তখন ইনস্‌পেক্টর বসে আছে, মাসীর সঙ্গে চুরি সম্পর্কে তদন্ত করছে।

অমৃতবাবুর নিজের লেখা চিঠিখানার সঙ্গে আমার মাসী তাঁকে যে চিঠিখানা লিখেছিল সেখানা একাধারে বিগলিত প্রেমপত্র এবং সকাতর মার্জনা ভিক্ষার স্বীকারোক্তি বহন করছিল, যেখানা পড়ে শোনালাম আপনাকে, সেখানকারও একখানা নকল ছিল। সম্ভবতঃ আমাকে অমৃতবাবু যে প্রেম নিবেদন করেছিলেন তার অকপটতা প্রমাণের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আমার অমতে তিনি প্রথম যৌবনের অঙ্গরঙ্গ বান্ধবীকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমার প্রতি তাঁর অনুরাগের গভীরতার প্রমাণ দেবার জন্য জীবনের গোপনতার তলদেশ থেকে প্রেমপত্রখানা তুলে পাঠাতে চেয়েছিলেন বোধ হয়।

একটু বেশী হেসে ফেলে বললেন—প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়ে যায়। প্রেমিকার কাছে সিনসিয়ারিটি প্রমাণ করা তো সহজ কথা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে—আমার উল্লাস। এবং চাইতাম কি জানেন—চাইতাম কোন-না-কোন ছুতোতে একটু আলুথালু চুলে ও পোশাকে ওঁর সামনে পড়ে গিয়ে জিভ কেটে সলজ্জিতা হয়ে থমকে দাঁড়াতে।

এমনি অবস্থার পটভূমিতে চিঠিখানা পেলাম। মাসীর লেখা চিঠিখানা (অমৃতবাবুকে

লেখা) পড়ে মন বলে উঠল—হেরে গেছে, হেরে গেছে, মাসী রাক্ষসী হেরে গেছে।

শুধু হেরে যাওয়া নয়; মাসী হাতজোড় করলে। হাতজোড় করিয়ে আমি ছাড়লাম। মাসী কথা বলছিল থানা অফিসারের সঙ্গে। আমি ঝিটাকে বললাম—একবার মাসীকে ডাকো। বল খুব জরুরী দরকার। খুব জরুরী।

মাসী আসতেই তাঁর লেখা চিঠির সেই নকলখানা তাঁকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—অমৃতবাবু এই চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর আমাকে লিখেছেন—আমি রাজী থাকলে উনি এ ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেবেন। আমি কি বলব? কি লিখবো? তুমি যদি বল—মণি, তুই চাপা দিতে বল, আমি তোকে বলছি—তা হ'লে তাই বলব আমি। কিন্তু নিজে থেকে তুমি না বললে আমি তা বলব না।

মাসী হতবাক হয়ে নিষ্পলক চোখে আমার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিল, কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে কোন ভাষা ছিল না। সে যেন বোবা চাউনি। শুধু বার কয়েক তার নিচের ঠোঁট দুটি খুব সূক্ষ্ম কম্পনে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আমি চোখ নামিয়ে একটু অপেক্ষা করে বলেছিলাম—মাসী?

মাসী বলেছিল—বেশ তাই বলছি।

আমিও তাই লিখলাম। এবং হলও তাই। কেসটা ধামাচাপা পড়ল।

বউদি বললেন—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ঠাকুর-জামাই যে, দেশের কর্তা মহলে ওঁর জানাশোনা আছে। হক সাহেব ওঁকে স্নেহ করতেন; উনি বলে ক'য়ে চাপা দিলেন ব্যাপারটা। কিছু যেন নগদও খরচ করেছিলেন। আমার গয়না গেল, ক্যাশ সার্টিফিকেটেরও হদিশ হল না; কিন্তু উনি লিখলেন—আমার সর্বস্বই তোমার। গহনার জন্য ক্ষেদ করিও না।

আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মণিবউদি; মুখে কাপড় দিয়ে হাসি ঢেকে বললেন—নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—চল্লিশ বছরের আধটাকপড়া অমৃতবাবুর যথাসর্বস্ব বিষয়সম্পত্তি সম্পদ সঞ্চয় থেকে হৃদয় পর্যন্ত সব কিছু ঝপঝপ করে এসে পড়ল এই অষ্টাদশী দেখনহাসি মণিমালার চরণতলে।

মাসখানেকের মধ্যে পত্র মারফতে আমাদের, কি বলব;—মন দেওয়া-নেওয়াই বলি, মন দেওয়া-নেওয়ায় পালাটি সুশেষ হয়ে গেল। অপেক্ষা রইল আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার। আঠারো বছর পূর্ণ হলেই আমি সাবালিকা হব। তার আগে হাতে হাতে বন্ধন হতে গেলে মাসী হয়তো অভিভাবিকা হিসাবে সে বাঁধনে কোপ মারতে পারে এই আশঙ্কায় অপেক্ষা করাই স্থির হয়েছিল। অমৃতবাবু, আপনার শ্যালকটি—আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়—এবং তখন তাঁর বয়স এসেছে যৌবনের ওপারের সিংহদরজার কাহাকাছি; আমার মত পূর্ণ সপ্তদশীর রূপযৌবনের প্রতি লালসা এবং লোভ যথেষ্টই ছিল, প্রেম-পত্রে প্রেমের কথা লেখবার সময় দিশাও হারাতেন, তবুও বলব লোকটি সুস্থির মানুষ, যাকে বলা হয় ধীর এবং

বিচক্ষণ তাই। তিনি নিজেই অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

মাসীর কাছ থেকে মাসখানেকের পরই আমার স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা করলেন। স্থির হল আমি এর পর থাকব Y. W. C. A. ইয়ং উয়োমেনস কৃশ্চান এ্যাসোসিয়েশন বোর্ডিং-এ।

মাসী আমার তখনই দু' চারটে কথায় ও কাজে পাগলামির পরিচয় দিতে শুরু করেছে। কিন্তু তখন আমরা কেউই সেটা বুঝতে পারি নি।

হঠাৎ মাসী আমার পদাবলী কীর্তন গাইতে শুরু করলে। একদিনের কথা বলি—ক'দিন থেকেই আমার ঘর থেকেই শুনতাম মাসী কীর্তন গাইছে। সেকালে তখনও পান্না কীর্তন-ওয়ালীর "ও কুব্জার বন্ধু। কেমন করে পাসরিলে রাই-মুখ-ইন্দু?" গানের রেকর্ডখানার যথেষ্ট সমাদর ছিল দেশে। যাদেরই গ্রামোফোন ছিল তারাই ওখানা রাখত। এবং কীর্তনের কথা উঠলেই লোকের ওখানার কথা মনে পড়ত। প্রথম দিন ওই দু' লাইন কানে এসেছিল, কিন্তু মনে এমন কিছু হল না বা হয় নি। তখন আমি যেন খানিকটা কেমন-কেমন হয়ে গেছি, বেশ অনুভব করছি যে, মাসীর দড়ি ছিঁড়ে ফেললেও ঠিক মুক্তি পাই নি। মনে হচ্ছে যেন আর একটা শেকলে বাঁধা পড়ছি। অমৃতবাবু তখন প্রত্যেকদিন একবার করে আসছেন। বাইরের ঘরে ব'সে আমার সঙ্গে দু' চারটে কথা বলে যাচ্ছেন। নিতান্ত সাধারণ কথা, তারই মধ্যে কয়েক বার লাল হয়ে যাচ্ছেন, তোৎলার মত কথা আটকাচ্ছে।

—কেমন আছ?

—কিছু দরকার টরকার থাকে তো বল?

—চল না একদিন মার্কেটে গিয়ে পছন্দ করে কাপড়-চোপড় কিনে আনব।

—ভাদুড়ীমশায়ের সীতা দেখে আসি চল। যাবে?

এখানে মাসীর কথা উঠত। আমিই বলতাম—অভ্যাসবশে আপনা থেকেই যেন বলে ফেলতাম—মাসীকে বলুন।

হেসে অমৃতবাবু বলতেন—কেন? কি প্রয়োজন? তবে তুমি চাও তো বলতে পারি। সঙ্গে নিতে চাও? সে কিন্তু ঠিক হবে না।

বিচিত্রভাবে অমৃতবাবুর ভিতর থেকে সনাতন পুরুষ তার অকৃত্রিম চেহারা নিয়ে সবল মুঠিতে প্রথমে আঁচল তারপর হাত, তারপর দু'হাতে ঝাপটে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি খানিকটা অসহায়ভাবে, খানিকটা পুলকিত-তনু হয়ে আত্মসমর্পণ করলাম।

ভালই লেগেছিল নন্দাই। অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। একটি সদ্য-উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের কাছে বোধকরি এর থেকে মিষ্ট এবং কাম্য আর কিছু নেই। এই সনাতন, এই শাশ্বত।

মাসী রত্নমালা যেদিন বাপের বাড়ীর সম্বন্ধ কাটিয়ে প্রেমে তপস্বিনী হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল সেদিনও এই সনাতন, এই শাশ্বত আকর্ষণেই এসেছিল। কিন্তু মাসীর এই পরিণামের কথাটা আমাকে ভয় দেখায় নি, আমি তাতে ভয় পাই নি।

কবিরা অবশ্য মেয়েদের রূপকেই বলেন আগুনের শিখা।

বেটাছেলেদের বলেন পতঙ্গ।

বলেন, পুরুষেরাই পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখা পুড়িয়ে মরে। কিন্তু না, বেটাছেলেরাই আগুন—মেয়েরাই পতঙ্গ। মেয়েরাই পুড়ে মরে।

হঠাৎ হেসে বললেন—আপনার শ্যালক থিয়েটারে সীতা দেখতে গিয়ে এই কথা বলে অভিযোগ করেছিলেন। মেয়ে জাতটাই হল আগুন; পুরুষ জাতকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে বিধাতা এই আগুন জেলেছেন সৃষ্টির আদিতে। আজও তাই করে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম—না। আগুন তোমরাই। তবে নেহাতই যদি জোর কর তাহলে বলব—মেয়েরা আগুন যেকালে ছিল—ছিল; একালে তারা পুরুষদের হাতের কৌশলে দেশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়েছে। সেও নেহাৎ সিগারেট ধরাবার জন্যে।

উনি হেসে বলেছিলেন—তুমি এমন কথা বল যে অবাক হয়ে যাই।

আমি হেসে বলেছিলাম—তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী। আমি অবাক হয়ে শুনি—কেবল শুনি।

আমার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে উনি বলেছিলেন—চল এখান থেকেই যাই কালীঘাট। মায়ের প্রসাদী সিন্দুর—।

আমি ভয় পেয়েছিলাম এতক্ষণে। বুঝতে পেরেছিলাম শার্দুলের ঘুম ভেঙেছে। মনে মনে পিছিয়ে এসে বলেছিলাম—না। আমি পড়ব। অন্ততঃ আই-এটা পাশ করতে দাও আমাকে—তার আগে না।

উনি চুপ করে বসেছিলেন। বুঝতে পারছিলাম নিজেকে সংযত করছেন। আমি ভয়ে ঘামছিলাম।

কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—বড্ড ঘামছ তুমি।

আসল সত্য ঢাকবার জন্য হ্যাঁ বলে এড়াতে চেয়েছিলাম। হাতখানা একটু টেনেও ছিলাম। তিনিও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

কথাগুলো হচ্ছিল থিয়েটারের বক্সে বসে।

এত-কথা এমন করে বলছি কেন জানেন। বলছি এই জন্যে যে এখনও আমি ঠিক যাচাই করে বুঝতে পারিনি কেন এমনভাবে ওঁর সঙ্গে লুকোচুরির মত খেলা খেলেছিলাম।

সবটাই কি মাসীর বন্ধুকে কেড়ে নেবার জন্যে?

কখনও মনে হয় তাই। হ্যাঁ, রত্নমালা মাসীর পরিণত যৌবনের শতকামনার যে বন্ধুটিকে সে পুজোর আসনে বসিয়ে পুজো করেও পায় নি, তাকেই আমার সপ্তদশ বসন্তের একখানি বকুল মালার লোভ দেখিয়ে হাতছানি দিয়ে দিব্যি হাঁটি হাঁটি পা-পা করে হাঁটিয়ে আসন থেকে উঠিয়ে আনাই ছিল এ খেলার মূল কথা।

কখনও মনে হয়—না। তাই সব নয়। পুরুষের সঙ্গে এই খেলা খেলার মত সাধের খেলা, সুখের খেলা মেয়েদের আর নেই—আর হয় না। এতে একবার নামলে আর রক্ষা থাকে না। বাঁধবাঁধা জল যেমন একবার বাঁধ ভেঙে সরু একটি ধারায় বেরিয়ে যেতে শুরু

করলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে ধারা গতিতে সবলা প্রবলা হয়ে ওঠে, দু'-কূলভাসিনী হয়ে তরঙ্গিনী হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই আমিও সেদিন ক্রমশঃ প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিলাম—আর তখন পিছনের ডাকে ফেরার উপায় নেই।

আবার চুপ করে গেলেন বউদি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—সেইদিনই থিয়েটার থেকে বাড়ী ফিরে শুনলাম মাসীর ঝি বললে—মাসী নাকি পাগল হয়ে গেছে। ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরে বসে আছে, বলছে—আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি। আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি।

আড়াল থেকে চোখে দেখলাম।

কানেও শুনলাম। অনেক অশ্রাব্য কথার সঙ্গে অনেক গান কীর্তন—পদাবলী।

পরের দিনই আমি চলে গেলাম হোস্টেলে।

মাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন অমৃতবাবু। কিন্তু কিছুই হয় নি চিকিৎসায়। দুবছর পরে মাসীকে রাঁচীতে পাঠিয়ে তবে আমাদের বিয়ে হল। তবে এই দু বছরের ভেতর মধ্যে মধ্যে মাসী বেশ ভালই থাকত; সে একেবারে ভাল থাকার মত ভালো। তখন আমার নামে নানান কলঙ্ক রটিয়ে আমাকে নামজাদা কলঙ্কিনী করে তোলাই ছিল তার একমাত্র কাজ। এইটিই ছিল তার পাগলামি।

অমৃতবাবুর আত্মীয়দের সকলকেই সে জানত। তাদের জনে জনে চিঠি লিখে আমার কলঙ্ক-কথা জানিয়েছিল।

কলঙ্ক পরসাদের সঙ্গে।

কলঙ্ক কমলকুমারের সঙ্গে। কমলকুমারও তখন এসেছে, ওঁর বাড়ীতে থাকে। আরও অনেকজনের সঙ্গে অনেক কলঙ্ক।

•

১৯৪২ সালের সেদিন রাত্রে মণি-বউদির কাহিনীতে এইখানেই ছেদ পড়েছিল।

রাত্রি তখন অনেকটা হয়েছিল।

প্রায় এগারটা। তিনি বলেছিলেন—তবে বুঝতেই পারলাম না ঠাকুরজামাই আমি সুখী না দুঃখী? অভাবটাই বা কিসের? কেন এমন ক'রে ফিরি? আপনি বলতে পারেন? আপনি তো লেখক! আমার মনটা পড়ে দিতে পারেন?

আমার মনে সেদিন নানান কথা ঘুরপাক খেয়েছিল। কিন্তু বলতে সাহস করিনি। অথবা মণি-বউদিকে এমন কোন আঘাত দিতে চাই নি যা শকথেরাপীর কাজ করে। এই এক ধরনের পাগলামির মধ্যে বেশ আছেন। কাজ নেই তাঁর ভাল হয়ে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম।

মুহূর্তে মণি-বউদি পাল্টে গিয়েছিলেন, মুচকি হেসে বলেছিলেন—নষ্ট চাঁদ দেখলে—আপনার নামে মিথ্যে কলঙ্ক হবে।

বুঝলাম ইঙ্গিতটা। মণি-বউদির তারিফ করলাম ওঁর বাকশক্তির জন্য এবং ওঁর এই অতি-

সহজ ললিত-রাগ-বিভোর চিত্তের জন্য। ইচ্ছে হ'ল বসে কথাগুলো বলে যাই। কিন্তু ভাগ্যে বলি নি। ওঃ কিছুদিনের মধ্যেই মণি-বউদিকে আবার যে নূতনরূপে দেখলাম—! মনে হ'ল মণি-বউদি বহুরূপা। বহুরূপী অর্থে নয়। সত্য অর্থে।

দশ

মণি-বউদিকে যে কারণে বহুরূপা বলছি তা হল এই—

যে মণি-বউদিকে, ভর্তিহুপুরে কলকাতার জনবিরল পথে, গিন্নীবান্নীর মত হাতীপাঞ্জাপেড়ে তাঁতের শাড়ী ঢলকো ছাঁদে পরে, শান্তিনিকেতনী ঝোলা কাঁধে, ঠাকুরমন্দির, গঙ্গার ঘাট, ভাগবতপাঠের আসর, জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরতে দেখেছি, আবার যাকে নিজের বাড়ীতে স্বামী অমৃতবাবুর নিমন্ত্রিত সংস্কৃতিবান, ধনবান, রাজনীতিক্ষেত্রের শক্তিমানদের মধ্যে ফেরতা দিয়ে আধুনিক ঢঙে সাজসজ্জা করে, বাঁকা ছাঁদে বেশ সুর করে প্যাঁচালো কথাবার্তা বলতে শুনেছি, সেই তাঁকেই একদা দেখলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে একজন বিলীতি বা আমেরিকান সাহেবের প্রায় অঙ্গলগ্না হয়ে উপর থেকে নীচে নেমে আসছেন। পোশাকে যা দেখেছিলাম, তা এর আগে আর কখনও মণি-বউদিকে পরতে দেখিনি। বগলকাটা, কাঁধকাটা, অর্ধেক বুক বের-করা জামা, রেশমী খস্‌খসে কাপড়, যার আঁচল ক্ষণে ক্ষণে কাঁধ ও হাত থেকে খসে খসে পড়েছিল, পায়ে শৌখিন নাগরা, এবং চোখে গাঢ় কালো গগল্‌স্—এই ছিল সেদিনের পোশাক; চুলের প্রসাধনও ছিল অদ্ভুত যার নাম আমি ঠিক জানি না। এবং তাঁর সারা অঙ্গ থেকে নির্গত প্রসাধনের সুরভির সঙ্গে একটা তীব্র অন্য গন্ধও মিশ্রিত ছিল—যেটা আমার মনে হয় তাঁর নিশ্বাস এবং দেহের রোমকূপ থেকে বের হচ্ছিল।

কালটা ১৯৪৪-এর প্রথম। ১৯৪২-এর সেই সেপ্টেম্বরের চন্দ্রালোকিত রাত্রিটির পৌনে দু'বছর পর। এই পৌনে দু'বছরের জীবন-নদীতে যত জল প্রবাহিত হয়েছিল, এবং তার তীব্র তরঙ্গভঙ্গে দুই কূলে যত ভাঙাগড়া ঘটেছিল, তার জোয়ারভাঁটা খেলা ভাগীরথীর বুকে প্রবাহিত হয়নি কিংবা তার দুই কূলে অত ভাঙাভড়া ঘটেনি।

সে-ভাঙাগড়া আমার জীবনের ভাঙাগড়াও বটে এবং অমৃতবাবু মণি-বউদির জীবনের ভাঙা-গড়াও বটে। ওই 'দুই পুরুষ' নাটকের পর থেকে যে খ্যাতি প্রতিষ্ঠার দ্বীপ গড়ে উঠল তার উপর ছোটখাটো দালানকোঠারও পত্তন হয়ে গেল। ওই সেপ্টেম্বরের রাত্রিটির মাসচারেকের মধ্যেই দুই পুরুষের শততম রাত্রির উৎসবের দিনে একদিকে বোমা পড়ল, অন্যদিকে আমার ভাগ্যে দুই পুরুষের সিনেমা কণ্ট্যাক্ট সই হয়ে গেল। দুই পুরুষের শততম রাত্রিতে মণি-বউদি এবং অমৃতবাবুকে প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আসেন নি; একটা ফুলের তোড়া এবং একখানা পত্রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভাষাটা ছিল ইংরেজী মিশানো, ইংরাজী অংশটুকুর গড়ন-বৈচিত্র্যের জন্য আবছা আবছা মনে আছে। আমার সাহিত্যকর্মকে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিলেন—

Congratulations for first century—go on completing another hundred not out.

এ-পত্রখানা অমৃতবাবুর। মণিবউদির পত্রও একখানা ছিল, সেখানা খুবই বিচিত্র। কমলকুমার এবং আর একজন লম্বা শক্ত-সবল দেহ হিন্দুস্থানী এসেছিল ওঁদের চিঠি এবং তোড়া নিয়ে। ফার্স্ট রো-এর পরই সেকেণ্ড বা থার্ড রোয়ের টিকিট কেটে দুই পুরুষ দেখে গিয়েছিল। বলেছিল, ওঁরা দিল্লি চলে গেলেন।

কমলকুমার বলেছিল, বড় কাজ ধরেছেন। একেবারে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবেন।

হিন্দুস্থানীটিই লছমন প্রসাদ। সে এসে ছিল তিন ঝুড়ি ফুল নিয়ে, গোলাপ ক্রিসেনথামাম; যার সবই ওঁরা নিয়ে গেছেন দিল্লী, বড়দিনের বাজার তখন সামনে। দিল্লীতে ভেট দেবেন। তারই মধ্য থেকে কিছু ফুল এবং পাতা দিয়ে একটা তোড়া বেঁধে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা। এসব আমার ভাল লাগেনি, তবে বউদি একখানা চিঠি দিয়েছিলেন লছমন-প্রসাদের হাতে। সে এক সময় আমাকে কমলকুমারের অগোচরে চিঠিখানা হাতে দিয়ে বলেছিল—ইয়ে চিঠ্‌ঠি তো দিদি আপকে দিলেন।

খামখানা সুদৃশ্য এবং সুরভিত।

খুলে দেখলাম, দুটি ছত্রে লেখা একখানি পত্র। প্রথমেই পদাবলীর কোটেশন—"তোমারই গরবে গরবিনী হাম।" তারপরই লেখা—'কিন্তু ভাগ্যে নেই। কি করব? দিল্লী যাচ্ছি। ইতি—বউদি। ভাল লাগল, বিশেষ করে পদাবলীর উদ্ধৃতিটুকু। কিন্তু এর মেকীত্ব কতটা তা আমার অজানা ছিল না।

দুই পুরুষের সেন্টিনারির পর আর দেখা একরকম হয়নি ওঁদের সঙ্গে। তবে তার আগে দেখা হয়েছিল। যার ফলে আর আমার আকর্ষণ বিশেষ ছিল না। কিন্তু সে থাক।

অমৃতবাবু দিল্লীতে আপিস খুলেছিলেন, বাসাও করেছিলেন ওখানে। কলকাতায় আসতেন-যেতেন; সে যাওয়া-আসা ভি-আই-পি পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত মার্গ ধরে যাওয়া-আসা। কখনও-সখনও খবর পেতাম, কখনও পেতাম না; তবে দু'চারবার তত্ত্বতল্লাসের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছি। এর মধ্যে আমার মেয়ের বিয়ে গেছে, বড় ছেলের বিয়ে; নেমন্তন্নপত্র আমার দিক থেকে করা হয়নি; আপত্তি ছিল অন্দর মহলের। গৃহিণী বলেছিলেন—দেখ, কুলীনের জ্ঞাতিত্বের দাবী, মরলে অশৌচ হয়। তিনদিন কোনরকম মাছটা না খেয়ে থাকে; আগে দাড়ী-গোঁফ কামাত না; এখন এইসব আপিসী সভ্যতার যুগে একদিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দিনে নিজে কামিয়ে নিয়ে চান করলেই অশৌচ চলে যায়। জ্ঞাতাশৌচে তো খবরই দেয় না। অন্নপ্রাশন, বিয়ে এসবে কোন দায়ই নেই। কুটুম্বিতে রাখলে থাকে, না-রাখলে থাকে না। আত্মীয় হিসেবে আত্মীয় মেনে তোমার সঙ্গে ওরা আলাপ করেনি। যেচে আলাপ করেছে লেখক হিসেবে। নেমন্তন্ন করেছে, গিয়েছ,—বেশ হয়েছে। আর থাক। তুমি আর নেমন্তন্নের ছেঁড়া চুলে বিনুনি পাকিয়ে খোঁপা বাঁধার মত ঝুটো সম্পর্ক পাকিয়ো না বাপু। আমার সম্পর্কে ওর সঙ্গে সম্পর্ক—আমারই তা সইবে না। আমার যারা সত্যিকারের আত্মীয়

তারা ওদের ভাল চোখে দেখে না। ভাল লোকও ঠিক নয়। তাছাড়া আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, ওদের ও-পাট নেই। ছেলে বলতে অমৃতদা, মেয়ে বলতে দেখনহাসি মণিবউদি। ওরা আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নৌকুতো দেবে, বিশেষ করে আমার সত্যিকারের আপনজনদের ছোট করবার জন্যে বেশ দেখানো করে দামী জিনিসপত্তর দেবে—আমরা নিয়ে খেয়ে থাকব তো! শোধ দেব কখন! কাজ তো হবে দুটো।

কথাটা চরম কথা। দুটো কাজ অর্থে ওঁদের দুজনের দুটো পারলৌকিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ। এবং তাও অত্যন্ত অনিশ্চিত, কারণ আমার ঐ ক্রিয়াটা আগে হয়ে যেতে পারে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

গৃহিণীর কথাগুলি যেমন নিষ্করুণ, তেমনি সত্যও বটে। আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালে ওঁরা যে ঐশ্বর্যের ঘটা ও ছটা বিকীর্ণ করে দেখনসাহী উপঢৌকন পাঠাতেন তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেও পাঠাতেন হৃদয়ের কোন প্রেরণায় নয়, পাঠাতেন আমাকে এবং আমার অন্য আত্মীয়জনকে চমৎকৃত করবার জন্য। তার সঙ্গে হেয় করবার প্রচ্ছন্ন বাসনাও যে তার মধ্যে থাকত না এমন কথাই বা কে হলপ্ করে বলবে?

"এইটেই ওদের ধারা।" আমাদের আপ্না-আপ্নির মধ্যে অর্থাৎ জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে বলা-কওয়া হয়—"এটাই অমৃতদের ঢঙ। ওই বউটার যেমন ঠমক!"

কথাটা মিথ্যে নয়। এর মূলে ছিলেন মণিবউদি। অমৃতবাবু নয়। অমৃতবাবুর উচ্চ-নাসাপনা ঠিক ঐশ্বর্যের ঘটার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোড়ার জীবনে তাঁর তো ঐশ্বর্য ছিল না। ঐশ্বর্যবানদের প্রতি এই বিদ্বান ও সেবাব্রতী ব্যক্তিটির অবজ্ঞা, এবং উদ্ধত বিদ্রোহী আচরণের ভিতের উপরেই ছিল তার প্রতিষ্ঠা। তার উপর ছিলেন কুমার ব্রহ্মচারী। আমাদের দেশে কুমারদের খাতির তো শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব থেকেও বেশী।

মণিবউদি আসতেই কুমারত্ব খিড়কীর দরজা দিয়ে নির্গত হল। বাকি রইল বিদ্যারত্ন এবং দেশপ্রেম, ও দুটোকেও মণিবউদি বিদেয় করলেন বাড়ীর পুরানো রাঁধুনী এবং চাকরটার-মত।

এ-উপমা উপমার জন্য বানিয়ে বলছি না। সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। মণি-বউদি ঠিক তাই করেছিলেন। আই-এ পরীক্ষার পরই ওঁদের বিয়ে হয়ে গেল। পরীক্ষার ফল বের হবার প্রতীক্ষাও করেননি অমৃতবাবু। অমৃতবাবুর মনোপিঞ্জরে বন্দী ক্ষুধিত শার্দুল খাঁচাটা ভেঙে ফেলেছিল। বিয়ের পর মণি-বউদি স্বামী গৃহে এসে প্রথম কিছুদিন অমৃতবাবু প্রমত্ততার ছোঁয়াচে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন, কোনদিকে তাকাবার অবকাশ পাননি। মাস আষ্টেক পর যখন খানিকটা ক্লান্তি এসেছে উভয়ের জীবনে এবং কাজের তাড়ায় টেনেছে অমৃতবাবুকে, তখন বাড়ীর দিকে তাকিয়ে মণি-বউদির মসৃণ ললাটে সারি সারি রেখা জেগে উঠল। বাড়ীটা যেন পরের দখলে। তিনি সিংহাসনে বসে আছেন—লক্ষ্মীর ঘরের আটনে নতুন পাতা লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মত, আর বাড়ীটার দখল নিয়ে বসে আছে অমৃতবাবুর পুরনোকালের রাঁধুনী কালীঠাকুর আর পশ্চিমা খানসামা রামধনিয়া। রান্নাশাল ভাঁড়ার ঘর এসবের মালিক ঠাকুর

এবং বাইরের দরজার মোটা তালাটা থেকে বাক্স প্যাটরা স্যুটকেস আলমারী এ্যাটাচি এ সমস্ত-কিছুর চাবিগুলোর জিম্মাদারী রামধনী চাকরের।

হুকুম খাটাতে গিয়ে তিনি বাধা পাননি, কিন্তু বিচিত্রভাবে অনুভব করলেন যে, এই লোকদুটো আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে দিয়েই তাঁর হুকুম এমনভাবে সংশোধন করিয়ে নেয় যে, তাঁর সংশোধিত ইচ্ছার সঙ্গে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন তফাৎ থাকে না। শুধু তাই নয়—আরও তাঁর নজরে পড়ল যে, এরাই দুজনে অমৃতবাবুর আত্মীয়স্বজনদের খবরাখবর রাখে, এ-বাড়ীর খবর ও-বাড়ীতে দিয়ে আসে ওবং অমৃতবাবুর যেটুকু স্বাধীন ইচ্ছা, সেটুকু ওই ওদের ইচ্ছার মধ্যে থেকেই যেন প্রকাশ পায়।

মণি-বউদি বলেছিলেন, (১৯৪২ সালের ওই রাত্রে নয়, পরে, অনেক পরে একদিন)—একদিন ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম ঠাকুরজামাই। দেখলাম কি জানেন—দেখলাম ঘি দিয়ে রান্না হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—উনি ঠাকুরকে বলেছেন, তেলের রান্না ওর সহ্য হচ্ছে না। উনি বললেন—হ্যাঁ, তেলের রান্নায় একটু অম্বল হচ্ছে কিন্তু ঘিয়ে রান্না করতে তো বলিনি। তবে আগে ওরা এইরকম করত। রান্না পাল্টাতো।

মণিবউদি এ নিয়ে কোন বিতর্ক না করে ঠাকুরটিকে বিহারে কারখানায় পিওনের চাকরী দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে জবাব দিয়ে বিদায় করেছিলেন। ওরা দূর হতেই অমৃতবাবুর আত্মসমর্পণ পূর্ণভাবে হল সম্পূর্ণ। মণি-বউদি নিজে নিলেন বাক্স, সুটকেস, আলমারি, এ্যাটাচির চাবীর গোছা। আরও করলেন। ছোট একটা ঘরে ইলেকট্রিক উনোন কিনে অমৃতবাবুর জন্যে ঘিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করলেন নিজের হাতে।

এইভাবে রত্নমালা মাসী থেকে পুরানো ঠাকুর-চাকর ছোট-বড় সকল প্রতীদ্বন্দ্বীকে দূর করে মণিবউদি যত সান্ত্বনাই পান, সুখ পেলেন না। শান্তিও না। সুখ কিসে তারও হদিস পেলেন না, শান্তি কোথায় তারও নিশানা, না।

এদিকে বছর-কয়েকের মধ্যে অমৃতবাবুর জীবনে যত বৈষয়িক উন্নতি হল, তত তিনি মডার্ন হলেন, তত তিনি ফ্যাশনেবল হলেন; তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বাড়ল সংস্কৃতির কমলহীরের ঝলমলানী। সে-ঝলমলানী আর আদরিণী মণিবউদি—দুইয়ে মিশে এক হয়ে গেল। অমৃতবাবুর জ্ঞাতিগোষ্ঠি যারা এতকাল ধরে অমৃতবাবুর উচ্চনাসাত্বের জন্য বিরূপ ছিল, তারা এবার অমৃতবাবুকে ছেড়ে মণি-বউদিকে নিয়ে পড়ল, কারণ অমৃতবাবুর নাকের উপর এখন মণিবউ পাঁসনে' চশমার মত শোভা পাচ্ছিল। রত্নমালা পত্রযোগে তাদের কাছে যে-সব অপবাদের বাণ পাঠিয়েছিল, সে-সব বাণ তারা নিক্ষেপ করতে লাগল তার দিকে।

মণিবউদি এগুলি অবজ্ঞার বর্মে ঠেকিয়ে ভূতলশায়ী করে চলতেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ সংঘর্ষও বাধত। কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক স্থানে একত্রিত হবার সুযোগ হলেই মণিবউদি যুদ্ধের তুরঙ্গিণীর মত ঘাড় উঁচু করে পা ঠুকে হ্রেষাবর ছেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতেন। এবং ঐশ্বর্যের ঘটা ও উচ্চ সংস্কৃতির ছটাময় উপঢৌকনরূপ বাণ

প্রয়োগে সকলকে আঘাত দিতে ও ঝলসে দিতে চাইতেন। এবং নিজেও আসতেন সেজেগুজে। সে সাজগোজে সোনা-রূপো, মণি-মুক্তোর কোন ছোঁয়াচ থাকত না। হাতে থাকত একহাত গালার চুড়ি, নয়ত কাচের চুড়ি। মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনী ঢঙের রূপোর গয়না পরতেন মণি-বউদি। এবং সেগুলো সবই সাঁওতালী গয়না। তার সঙ্গে দু-চারটে পাথর বসানো থাকতো। লাল এবং সবুজ পাথর। রুবি আর পান্না। মস্ত খোঁপায় এই এত বড় একটা রূপোর ফুল, তা থেকে কানে ঝোলান ঝুমকো। অবাক হয়ে দেখতে হত। কাজেই এটা সকলেই অপছন্দ করত। এই ধরনের আক্রমণাত্মক ঐশ্বর্য দেখানটা কারুর কাছেই ঠিক পছন্দের নয়। আমার গৃহিণীর যুক্তি সংক্ষিপ্ত হলেও তার অর্থ ছিল অনেক।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির পর হয়ত আমার এই কথাটি ঠিক বিশ্বাস্য হবে না বলেই আর একটা দেখা হওয়ার কথা বলি। বোধ করি, অক্টোবরে; পূজোর আগে; বিয়াল্লিশের সেই ইতিহাস-বিখ্যাত সাইক্লোন তখনও সামনে। ওদিকে আগস্ট আন্দোলন ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানের জীবনকে চঞ্চল করে তুললেও কলকাতায় ইংরেজের সামরিক বাহিনীর চাপে মূর্ছাহত। আমার পূজোর কাজ শেষ হয়ে গেছে; তখন আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই 'গণদেবতা' লিখছি। একদিকে লিখে কপি যোগাচ্ছি অন্যদিকে ছাপা হচ্ছে। বিন্দুমাত্র অবসর নেই। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় কেমন করে ওঁদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ঠিক বলতে পারি নে। তবে একটা সঙ্গত কারণ ছিল। সেটা হল—দিল্লীর বহু বিখ্যাত ঘণ্টেওয়ালার দোকানের 'সোহন হালুয়া'; এবং খস-খস আতরের একটা তত্ত্ব না তল্লাস সকালে এসে পৌঁচেছিল ওঁর কাছ থেকে। বাহক আর কেউ নয়, কমলকুমার। সে বলেছিল—"উনি মানে খুড়ী ফিরেছে কাল দিল্লী থেকে। এই সব জিনিস এনেছে। এখন আমার উপর অর্ডার হয়েছে দিয়ে এস ঘরে ঘরে পৌঁছে।"

ওঁদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে যখন খেয়াল হল যে, আমার চরণযুগল আমার অজ্ঞাত মানসের আদেশ বা নির্দেশে চালিত হয়ে ওঁদের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিয়েছে, তখন সোহন হালুয়া বা খসখস আতরের জন্য ধন্যবাদ রচনা করে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

বাড়ীর চাকর-বাকরেরা মোটামুটি চিনে রেখেছিল। বাড়ীর দরজায় একজন গুর্খা দারোয়ানও ছিল। সেও চিনত। এবার গিয়ে দেখলাম তারা কেউ নেই; এক দারোয়ান ছাড়া সেটকে-সেটই নতুন। অসুবিধে হল। সবাই জিজ্ঞেস করে কাকে চাই। এবং সকলেই যেন অবজ্ঞা ভরে তাকায়। কারণটা বুঝতে আমার দেরি হয় নি। আমার জীবনে এটা প্রায় অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল। আমার চেহারা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দু-দিকেই খাট এবং ক্ষীণ। গায়ের রঙও কালো। একবার একজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাকে বাড়ীর গমস্তা ভেবে পান খাবার জন্য কিঞ্চিৎ দিয়ে আমাদের সেরেস্তায় কার্যোদ্ধার করে নিতে চেয়েছিলেন। এবং আজও অনেকে এসে আমাকেই বলেন—ওঁকে ডেকে দিন, দরকার আছে। সুতরাং রাগ করি নি, বা চলে আসি নি; একটু গলা উঁচু করে বলেছিলাম—বউদি, এরা আমাকে

আপনার নন্দাই বলে মানতে চাচ্ছে না। একটু নেমে আসুন।

নেমে তিনি আসেন নি, ওঁর ঝি (সে পুরানো লোক) আমাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিল—ওমা আপনি!

সরাসরি পর্বটায় ছেদ টেনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বউদি কোথায়? কণ্ঠস্বর একটু শুকনো-শুকনো হয়ে উঠেছিল ঝিকে দেখে। সেদিনের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে একান্ত নিরালায় বউদির আত্মকাহিনী শোনার পর আমাকে অভ্যর্থনার জন্য তাঁকেই প্রত্যাশা করেছিলাম, তাঁর বদলে ওই ঝিটিকে দেখে কণ্ঠস্বর শুষ্ক হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিকভাবে।

বলেছিল, উপরে। একটু কাজে ব্যস্ত আছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। একটা অবজ্ঞা বা অবহেলার ধাক্কা যেন আচমকা বুকে এসে লেগেছিল।

বলেছিলাম—তা হলে আমি যাই।

ঝি বলেছিল—না-না। আমি খবর দিই, দাঁড়ান।

—কি দরকার?

—না। শেষে আমার উপর রাগ করবেন। এ বাড়ীর সবারই চাকরি গিয়েছে, শুধু দারোয়ান আর আমি আছি, শেষে আমারও যাবে। একটু বসুন।

আমি বসলাম, ঝি দ্রুত চলনেই উপরে উঠে গেল। ওঁদের প্রমুখাৎ শুনে এবং আমার সঙ্গে ওঁদের ব্যবহারের ধারা দেখে আমার সম্পর্কে মেয়েটি একটা ভাল ওজনও আন্দাজ করে রেখেছিল। ঝি-এর এই ব্যস্ত-সমস্ততা আমার ভালই লেগেছিল। মনে-মনে ঠিক করে-ছিলাম, বউদি এবার নিশ্চয় নামবেন এবং হাত ধরে বলবেন—দেখুন তো এমন অন্যমনস্ক হয়ে গিছলাম, ছি-ছি ছি, আপনার গলা শুনেও বুঝতে পারি নি, কথার ছন্দ থেকেও খেয়াল হয় নি যে, এ ছন্দ আপনি ছাড়া আর কারুর হতে পারে না। 'এরা আমাকে আপনার নন্দাই বলে স্বীকার করছে না।' এবং কথা শেষ করে কাপড়ের আঁচল চাপা দিয়ে সম্মুখের দেখনহাসি দাঁত দুটিকে আবৃত করবেন। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, এর উত্তরে বলব—"সেদিন আকাশের স্বপ্নপারাবারে একাদশীর চাঁদ খেয়া দিতে-দিতে সাক্ষী হয়েছিল, আজ আকাশে চাঁদ নেই কিনা, তাই ভ্রম হয়েছে, আপনার দোষ নেই।"

ঠিক এই সময়েই নেমে এলেন মণি-বউদি। কিন্তু ঠোঁটে এতটুকু হাসির রেখা ফুটল না, চোখের দৃষ্টিতে এতটুকু দীপ্তির ঝিকিমিকি জাগল না, সারা শরীরের ছন্দে এতটুকু হিল্লোল বইল না, তিনি সোজা শক্ত ভঙ্গিতে চটির শব্দ তুলে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালেন একটি নমস্কার করে, বললেন—নমস্কার! অত্যন্ত দুঃখিত, কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম! তারপর? কেমন আছেন? বাড়ীর সব ভাল আছে তো? সোহন হালুয়া খেয়েছেন? খসখস আতর?

যত কিছু প্রশ্ন ছিল, সব পর-পর ক'রে গেলেন, যেন একটার উত্তর নিয়ে আর একটা প্রশ্ন করতে সময় কিছু বেশী ব্যয় হবে। যার অর্থ হল, তাঁর সময়ের অত্যন্ত অভাব। আসলে প্রশ্নগুলোর কোন উত্তরই তিনি চান না।

সেটা বুঝতে আমার বিলম্ব হয় নি। এবং অত্যন্ত চতুর ভাবেই এর পর দু-তিনটে কথায় ওখানকার পালা সেরে আমি উঠে পড়েছিলাম এবং বলেছিলাম—আজ তাহলে উঠলাম।

ভদ্রতার খাতিরেই বোধহয় বলেছিলেন,—একটু কফি খাবেন না? সে কথা শেষ করতে দিই নি। বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না বউদি দোহাই আপনার, বিষ খেতেও রাজী আছি, কিন্তু চা কফি, কি মিষ্টি জল, এ না। আপনার ঘৃতসিক্ত সোহন হালুয়া যা বস্তু; বাপ্‌স্ আমার মাথার চুলগুলো থাকলে হয়। ওঃ, গলায় গলায় অম্বল হয়ে আছে।

বলে চলে এসেছিলাম। আসতে আসতে ভেবে পাই নি মহিলাটির এমন আচরণের অর্থ কি? দুটো-তিনটে দিন যতদূর মনে পড়ছে ওঁর এই বিচিত্র আচরণের কথা চিন্তা করে মনে-মনে কিছু পীড়া অনুভব করেছিলাম। এর পর আর ও-মুখো হই নি। কি প্রয়োজন? প্রয়োজন ছিল না, প্রলোভন ছিল ওই মণি-বউদির মত চপলা খেয়ালী মেজাজের মডার্ন বউদিটির জন্যে। তবে ও প্রলোভনটা আমার কাছে খুব বড় প্রলোভন ছিল না। কারণ তখন আমি আরও একটা বড় প্রলোভনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে চলেছি। খ্যাতির প্রলোভন ও প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ। এবং আজ সত্যকে গোপন করব না, অকপটেই বলব যে, তখন পত্রযোগে অনেক মুগ্ধার প্রশস্তি আমি পাচ্ছি। থাক। এখন সহজ সোজা ভাষায়—যা ঘটেছিল তাঁর ও আমার মধ্যে—তাই বলে যাই। আমি আর ওপথ মাড়াই নি। ওঁরাও আর ঠিক খোঁজ করেন নি। একেবারে ওই দুই পুরুষের শততম রজনীর অভিনয় উৎসবে কমল-কুমার এবং লছমন মারফৎ একখানা চিঠি আর একটা খুব ভাল ফুলের তোড়া পেলাম। দিয়েছেন বিচিত্র-রূপিণী মণি-বউদি। আর একখানা চিঠিতে সেটা দিয়েছেন অমৃতদা—"Go on completing another hundred not out—"

সেদিন শুনলাম আমার জীবনে দুই পুরুষের শততম অভিনয় যত গৌরবের, অমৃতবাবু এবং মণি-বউদির জীবনে দিল্লীতে অভিনব ব্যবসায়ের কালোগৌরব অর্থাৎ আর্থিক বহু বাহুল্য, তার থেকে কোন ক্রমেই কম নয়। অনেক বেশী। ব্যাপারটা লোহার পারমিট নিয়ে রহস্যজনক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

এর পর আমার জীবন যেমন দ্রুতবেগে চলেছে, ততোধিক দ্রুতবেগে চলেছে ওঁদের জীবন। হিমালয় থেকে বেরিয়ে সিন্ধু যেমন পশ্চিম মুখে এবং ব্রহ্মপুত্র যেমন পূর্ব মুখে বেরিয়ে বিপরীত দিকে চলে গেছে, যেমন ভাবেই ওঁরা দুজনে দিল্লী কলকাতা, বোম্বাই-এর ব্যবসায়ের বাজারে আমার থেকে একেবারে বিপরীত মুখে অনেক দূরে চলে গেলেন।

ক্রমে ভুলেও গেলাম তাঁদের কথা। ওঁরাও নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন আমার কথা। হঠাৎ সেদিন মণি-বউদিকে দেখলাম গ্র্যাণ্ড-হোটেলে। মণি বউদির নূতন প্রকাশ দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

হায়, মণিবউদি।

বিচিত্র মণিবউদি। এও তাঁর প্রকাশের শেষ নয়। এর পরও আছে।

এগার

বলা চলে এর এক যুগ পর।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ-যুগের যুগ নয়, সচরাচর যে-যুগ আমরা বারো বছরে গণনা করে থাকি, সেই যুগ। অর্থাৎ বারো বছর পর।

১৯৪৪ সাল আর ১৯৫৬ সাল। বারো বছর পর আবার মণিবউদিকে দেখলাম। ১৯৪৪ সালে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে একজন বেশ ভারিক্কি জবরদস্ত শ্বেতাঙ্গের প্রায় বাহুলগ্না হয়ে বিচিত্রবেশিনী মণিবউদিকে সেই যে দেখেছিলাম, তারপর এই বারো বছরের মধ্যে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। যে-তিনি বা যে-তাঁরা অর্থাৎ মণিবউদি এবং অমৃতবাবু আমার সঙ্গে উপযাচক হয়ে ডেকে দেখা করে তিনপুরুষ আগের মরচে-ধরা বা ময়লাপড়া সম্পর্ক-শৃঙ্খলের জোড় আবিষ্কার করে, তাকে মেজেঘষে নতুন করে পান ধরিয়ে আমাকে এতখানি সমাদর করে সযত্নে বাঁধতে চেয়েছিলেন, সেই-তিনি বা সেই-তাঁরা এরপর যেন মর্তলোকের মঞ্চ থেকে অকস্মাৎ দেবলোকে চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেলেন। বলা চলে—শিকলের সম্পর্ক কেটে চলে গেল, আর এল না। যে মণিবউদি ১৯৪২ সালের ব্ল্যাক আউটের কল্যাণে প্রাপ্ত একটি দুর্লভ জ্যোৎস্নালোকিত ভাদ্র রজনীতে খোলা বাতায়নের পাশে বসে জানালার দিকে মাথা রেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অকপট অন্তরঙ্গতায় তাঁর বিগতজীবনের কথা বলেছিলেন, তিনি এর পর আর ভুলেও একছত্র পত্রযোগে আমাকে আমার জীবনসাফল্যে উৎসাহিত করলেন না। কাব্য করে 'তোমার গরবে গরবিনী হাম' লেখা দূরে থাক একেবারে মেঠো গদ্যতেও লিখলেন না—'আপনার সম্মানে সুখিনী হইলাম', অথবা 'সাবাস' জানাচ্ছি।

দুই পুরুষের সাফল্যের পর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কালটা তো কম নয়। বারো বছরেরও বেশী; চোদ্দ বছর। এর মধ্যে দুইপুরুষ থেকে আরও অনেক উজ্জ্বলতর সাফল্য আমার জীবনে এসেছে। এবং এই যুগপরিবর্তন, যাকে সত্য অর্থে বলা যায় যুগান্তরের, সেই যুগান্তরের মধ্যে যে-যুগ গেল, তারও প্রসাদ যেমন পেয়েছিলাম আমি, নবাগত যুগের অকৃপণ প্রসাদও আমি ঠিক তেমনি পেয়েছিলাম। আগন্তুক যুগের প্রসাদগুলি উজ্জ্বলতর ছিল তাও আগে বলেছি। তাছাড়াও সে-প্রসাদের বার্তা শুধু মর্ত্যলোক অর্থাৎ বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল না—যাকে দেবলোকবাসিনী মণিবউদি এবং দেবলোকবাসী অমৃতবাবু অনায়াসে ডাকে তিন পয়সার পোস্টকার্ডযোগেও কিছুটা বাহবা দিতে পারতেন। এবং এ-দেওয়া তাঁদের মত মানুষ যাঁরা, তাঁদের কাছে তো হীরের বালা-পরা হাতখানি ঘুরিয়ে বালার হীরে থেকে ঠিকরে-পড়া ছটায় চোখ-ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত কৌতুকের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। সুন্দরী মণিবউদি

অনায়াসে লিখতে পারতেন—"তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।" তাতে এই রূপহীন কালো মানুষটিকে দারুণ ঠাট্টা করা হতো। এবং অমৃতবাবু এবার ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলের হ্যাট্রিক ট্যাট্রিক গোছের নতুন কিছু বলে উৎসাহিত করতে পারতেন। সেটা রেকর্ড হয়েও থাকতে পারত।

থাক।

লেখার সুর বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং বঁড়শির মত নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, যাতে বুঝতে পারছি, ওঁদের উপর আমার মনের বিদ্বেষ আজও যায়নি। অথচ মণিবউদির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা সামনে পড়ে রয়েছে।

যা বলার তা সোজা কথাতেই বলা ভাল। অনেক কাল আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনেছিলাম—"এ তোমার ভালো তোমাতে থাক, আমায় তো তার ভাগ দেবে না।" শুধু ভালোই বা কেন, মন্দর বেলায়ও তো তাই বলা উচিত। মন্দের ভাগও তো কেউ নেয় না। মণিবউদি-অমৃতদার ভালো, সে-ভালোর পরিমাণ বৃহৎ এবং বিপুল, তার ভাগ কাউকে ওঁরা দিন বা না-দিন, ওঁদের ভালো থেকে খসে-পড়া ঝরে-পড়া ভালো অংশ বহুজনে কুড়িয়ে নিয়েছে, পিছন থেকে পাশ থেকে টেনেটুনে বাগিয়েও নিয়েছে, আমি তাদের দলের নই, এ আমার অহংকার।

ওঁদের সংস্পর্শ, ওঁদের সংবাদ ওই ১৯৪২ সালেই আরম্ভ, ১৯৪২ সালেই শেষ। শেষ উপঢৌকন খসখসের আতর আর সোহন হালুয়া। এবং শেষ সাক্ষাৎ ওঁদের বাড়ীতে, সেই শীতল সাক্ষাৎ। ১৯৪২-এর সাইক্লোনের সপ্তাহ-দেড়েক আগে। তারপরই সব যেন চুকে-বুকে গেল। এরপর বাংলাদেশে যুগান্তরের ঘুরপাক যেন গাজনের চড়কপাটার মত ঘুরতে লাগল। বর্ণনার দরকার নেই। এ-ইতিহাসের কথা। সাইক্লোন মন্বন্তর থেকে নাগাসাকি হিরোসিমা পর্যন্ত যা ঘটেছিল তাতে পৃথিবীর মানচিত্রের রঙ পাল্টালো, চেহারা পাল্টালো ভূগোল নতুন করে লেখা হল, ঝড়ে বন্যায় দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মহাযুদ্ধে মহাপ্রলয়ের একটা ঝাপ্‌টা এসে কাকে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেললে, তার খবর রাখবার অবকাশ কারুর ছিল না। এর মধ্যে আমিও কালের প্রসাদধন্য এবং মণিবউদিরাও তাই শুনেছিলো; তবুও তাঁদের সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না। ১৯৪৪ সালে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে ওই নতুন রূপে মণিবউদিকে দেখে যে বিস্ময় এবং যে-প্রশ্ন জেগেছিল, তার উত্তর পাবার জন্য কৌতূহল আমার জাগ্রত হয়নি এমন নয়, কিন্তু তার উত্তর পাবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে পারিনি। তার আগেই অন্যকিছুর টানে অনেক দূরে গিয়ে পড়তে হয়েছে; মনে মনে অনেক দূরে, নইলে বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে গ্রে স্ট্রীটের একটু ওধার—সে আর কতটুকু পথ!

ওঁরা অবশ্য তখন মর্ত্যলোকে থাকতেন না। ১৯৪২ সালেই মর্ত্যভূমি-রূপ এই ঘিঞ্জি কলকাতা নগরী ছেড়ে দিল্লী গেছেন। সে কথা আগেই বলেছি। এবং উড়োভাসা যে দু'চারটে খবর বা কথা—সে গুজবই হোক আর সত্যই হোক তাই মনের এই দুর্বল কৌতূহলকে আপনা-আপনি স্তিমিততর করে প্রায় নিভিয়ে এনেছিল।

১৯৪৪ সাল। যে-সময়ে রাশি রাশি নোটের বাণ্ডিল এনে এই গরীব দেশের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল দুটি দেশ—ইংলণ্ড ও আমেরিকা। সে-সময় একাদশে বৃহস্পতি থাকার জন্যই হোক আর শনি তুঙ্গী থাকার জন্যই হোক অথবা উভচরী যোগের কল্যাণেই হোক, অমৃত-মণি দম্পতি বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা বড় কারখানার মালিকানা অর্জন করেছিলেন বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে।

জল প্রচণ্ড হিমে জমে বরফ হয়, তখন জলকে সে ঢেকে রাখে, তার স্রোতকে সে রুদ্ধ করে। কিন্তু বরফ যখন গলে, তখন জল হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। অমৃতবাবু জলই হোন আর বরফই হোন, এক সময় বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে ব্যবসায় ধর্মে একাত্ম হয়ে মিশে গিছলেন।

এসব শোনা কথা মাত্র, তার অধিক কিছু নয়। এবং এ নিয়ে আমার দিক থেকে শিরঃপীড়া বা গাত্রদাহেরও কারণ ছিল না এবং আমার নিজের হাতের মাপে আমার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত থেকে এতটুকু খাটিয়ে যায়নি। বরং তার বিপরীতই হয়েছিল। আমার হাতের মাপে আমার দৈর্ঘ্য কিছু বেশীই হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালে দিল্লী গেলাম। আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছি, সেই পুরস্কার আনতে গেছি। তখনও দিল্লীর বিখ্যাত বিজ্ঞানভবন সম্পূর্ণ এবং ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয় নি। পুরস্কার বিতরণের জন্য বর্ণাঢ্য সামিয়ানা খাটিয়ে মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল। তখন আকাদেমির সভাপতি স্বর্গত তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষে ছিলেন না, বিদেশে গিয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বর্তমানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন।

মণ্ডপের মধ্যে সভাপতির বেদী ও আসনের ঠিক ডানদিকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল—সম্মানিত লেখকবর্গের আসন; বাঁদিকে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি করে বসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। এবং সামনে ছিল সারিবন্দী নিমন্ত্রিত অতিথিদের আসন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা ছিলেন, পার্লামেণ্টের সভ্যরা ছিলেন, বড় বড় রাজকর্মচারীরা ছিলেন। তাছাড়া যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বড় কম পদস্থ নন—তাঁরা ওখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিজীবনের দাবীতে; সে-ব্যক্তিত্ব সম্পদের মুকুটেও উজ্জ্বল হতে পারে আবার বিদ্যা বা গুণপনার মুকুটেও উজ্জ্বল হতে পারে। শিল্পপতি এবং বড় বৈজ্ঞানিক পাশাপাশি বসেছিলেন সেখানে। তাঁদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। এবং তাঁদের গুণের কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে যথাযোগ্য সম্ভ্রম জানিয়ে তাঁদের রূপের এবং বেশভূষার ও দীপ্তিছটার কথা এই বয়সেও বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলব যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পূজ্য প্রাপ্য নারীর এবং তারপরের যে-পূজ্যটি সে-পূজ্যটি প্রাপ্য রূপের, অর্থাৎ রূপসী নারীর থেকে রমণীয়াও কেউ নেই এবং পূজার দাবীও কারুর নেই। পূজা নিয়ে যদি বা জ্ঞানের ও গুণের আদালতে ইনজাংশন পড়ে, তাহলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, চোখের আরতি ওঁরাই পাবেন, চোখ ওঁদের উপরেই আগে পড়বে। পুরুষরাই যে মেয়েদের দিকে তাকান তা নয়, মেয়েরাও আগে তাকান মেয়েদের দিকে। তবে তাঁরা তাকিয়ে দেখেন ঈর্ষার

দৃষ্টিতে ; অর্থাৎ যে-রূপ তাঁর রূপ থেকে উজ্জ্বল, সে-রূপের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি দেশ-লাইয়ের কাঠির মত ফস্ করে জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দিতে চায়। রূপবান গুণবান ঐশ্বর্যবান প্রিয়তমের বামভাগে বসেও তাঁরা কোন সামান্য ব্যক্তির রূপসী প্রিয়তমার দিকে ওই একই দৃষ্টিতে তাকান। এত কথা বলার কারণ এই যে, সেদিন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—একটি নিরাভরণা শুভ্রবসনা সুন্দরীর দিকে। সাদা পোশাক, খালি হাত, খাটো করে কাটা চুল অনেকটা বব করার মত হলেও যেন কিছুটা গরমিল আছে ; নিখুঁত সাদা বেশবাসের উপর একখানা কাশ্মীরী শাল, তারও রঙ সাদা। অতি চমৎকার তাঁকে মানিয়েছিল। পরিপূর্ণ যুবতী বলেই মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, সামনের সারিতে তাঁর আসন ছিল বলে দেখতে পেয়েছিলাম যে, তাঁর পায়ের স্লিপারের রঙটাও শাদা। চোখে রিমলেশ চশমা। নাকের উপরে সোনাটুকু ঝিকমিক করছে। আর বয়স সত্ত্বেও আশ্চর্য স্নিগ্ধ লাগছিল। বেশ একটু রোগা হয়ে গেছেন যেন।

যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝবার কথা যে, মহিলাটি বিধবা। কিন্তু যদি এ-প্রশ্ন ওঠে যে, ওই সাদা পোশাকের মধ্যে বৈরাগ্য বড়, না রুচি বড়, তাহলে প্রশ্নটা মুহূর্তে জটিল হয়ে উঠবে। এবং যিনি প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনি থমকে যাবেন, এ-কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

পাঠকেরা বুঝতে নিশ্চয় পারছেন যে তিনি মণিবউদি। সেই তাঁর সামনের দাঁত-দুটি ঈষৎ উঁচু। বয়স হিসেব মত পঞ্চাশের ধারে পৌঁচেছিল নিশ্চয়, কিন্তু তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি মুগ্ধবিস্ময়ে একটু বেদনার সঙ্গেই তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। মুগ্ধতার কারণ, বিস্ময়ের কারণ আমার একার ছিল না, সেটা ছিল প্রায় সবার ; দেখেছিলাম তো, সকলেই এই শুভ্রবসনা পরিপূর্ণ স্থিরযৌবনা মেয়েটির দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। তাঁরা বেদনাবোধ করেন নি, করবার হেতুও ছিল না। কিন্তু আমি বেদনাবোধ না করে পারিনি। সেইটুকুই ছিল আমার নিজের। আত্মীয় হিসেবে ছিল আমার মণিবউদিকে দেয়।

মণিবউদি বিধবা ? অমৃতবাবু নেই ?

মণিবউদি আমার দিকে কয়েকবারই তাকালেন। চোখোচোখি যাকে বলে—চোখের তারায় তারায় দৃষ্টি বিনিময়—তাও কয়েকবার হল। কিন্তু একটুও হাসলেন না তিনি। চিনলেন কিনা তাও যেন বুঝতে পারলাম না।

সেবার চৌদ্দটি ভাষার মধ্যে Bengali অর্থাৎ বঙ্গভাষার লেখকের পুরস্কৃত হবার পালা সর্বপ্রথম। A. B হিসেবে বাংলার স্থান দ্বিতীয় কিন্তু অসমীয়া ভাষায় কোন গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়নি বলে প্রথম A অক্ষরের আসন ফাঁক থেকে গিছল। আমার নাম ঘোষিত হল, আমি পুরস্কার নিয়ে ফিরে এসে বসলাম। এবার দেখলাম মণিবউদি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

বারো

আকাদেমী অ্যাওয়ার্ড বিতরণী সভায় মণিবউদির সঙ্গে চোখ চোখে মিলিয়ে দেখা হল, তিনি আমার দিকে বার দুয়েক চোখ মিলিয়ে তাকালেন; কিন্তু কোন সাড়া যেন পেলাম না। আমি বার বার তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম, অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে থেকেছিলাম, মুগ্ধ হয়েও দেখেছিলাম—তাঁকে ভাল করে বিশ্লেষণ করেও দেখেছিলাম।

মণি-বউদির শুভ্র বেশবাসের মধ্যে বর্ণাঢ্যতার অভাব ছিল কিন্তু দীপ্তির অভাব ছিল না; বৈধব্যের সকরুণ ইঙ্গিত ছিল কিন্তু তা তাঁর রূপকে ম্লান করেনি অথবা তাঁর ভিতরের জনটিকে বিশেষ বিষণ্ণ-মলিন করেছে বলেও মনে হয়নি। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিকটা বেদনার সন্ধান করেছিলাম; চোখের দৃষ্টি ঠোঁটের কোণ এমন কি সমস্ত কিছু নিয়ে এই শুভ্রবসনা সুন্দরীটির অবয়ব ও কান্তিতে কোন কিছুর একটি অস্পষ্ট ছায়াও আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে হ্যাঁ, এ কথাটা স্বীকার করব যে তাঁর সেই ঈষৎ উঁচু দাঁত দুটির শুভ্রচ্ছটা দিয়ে সে সুহাসিনী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন আর চলত না; সেই 'দেখন-হাসি' রূপটি তাঁর গাম্ভীর্যের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এমনি কি আমার সঙ্গে দু-দুবার তাঁর চোখোচোখি হওয়ার সময়েও সে দেখনহাসি সুপ্রসন্না মণিবউদি চকিতের জন্যও উঁকি মারেন নি।

এর ফলটা আমার কাছে কিছু রূঢ় হয়ে উঠেছিল। তিক্তও বলা যায়। মানুষের মন তো! মনের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের কাছে শোনা যত কনফিডেন্সিয়াল মার্কা—কালো মলাটের ফাইল-বন্দী—চুপিসারের কাহিনীর কাগজ দমকা হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে শুরু হয়েছিল আমার চোখের সামনে।

লছমনপ্রসাদ, কমলকুমার, অজ্ঞাতনামা ক্যাপ্টেন বা মেজর বা কর্নেল বা মিস্টার প্রভৃতি জনের নামগুলোও মনে পড়ে গিয়েছিল।

তা যাক। তাতেও মণিবউদির প্রতি ঘৃণা হয় নি বা তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ এক বিন্দু কমে নি। আমি প্রশ্নকুঞ্চিত ললাট নিয়েও অবাক হয়ে দেখেছিলাম তাঁর রূপ। মণি-বউদিকে যত দেখলাম তত মনে হল মণিবউদির রূপ যেন এই পরিণত পূর্ণ যৌবনে রূপে রসে আশ্বিনের কানায় কানায় ভরা দীঘির মত আশ্চর্য মনোহারিণী এবং শীতলাভাসে টলোমলো হয়ে উঠেছে। না, এও যেন হল না। একেবারে পরিপূর্ণ খুলে যাওয়া লাল পদ্ম দেখেছেন? এমন ফুটেছে যে পাপড়িগুলোর একটু একটু খ'সে পড়ি-পড়ি ভাব, গন্ধ বেশ-কিছু গাঢ় কিন্তু বাসী নয়। ভিতরের মর্মকোষ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত; সব নিয়ে মনে হয় যৌবন যেন পূর্ণ, রূপ যেন তন্দ্রালু হয়ে পড়েছে মণি-বউদির সর্বাঙ্গে।

সব থেকে বেশী মনোহারিণী করেছিল তাঁকে তাঁর চুলের রুক্ষ শোভা এবং খাটো বিন্যাস। বলতে ভুলেছি চুলের খাটো বিন্যাস্ত ওঁর তখন থেকেই। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে যখন ওঁকে দেখেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম তাঁর খাটো করে ছাঁটা রুখু চুলের বিন্যাস। কাঁধ পর্যন্ত বেশ থাক বেঁধে দুলছে। কিন্তু তখন যে কোন কারণেই হোক এমন ভালো

লাগে নি। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর জীবনাকাশে তাঁর রূপচ্ছটা একেবারে মধ্যগগন-বিহারিণী। বয়স তখন তাঁর বোধ করি পঁয়তাল্লিশ। ওই সভায় মহিলার সংখ্যা কম ছিল না। পাঞ্জাবের রূপের নাম-ডাক আছে এবং রঙের জৌলুসে ও দীর্ঘাঙ্গীত্বের ছন্দে তরুণী বয়সে ওঁদের আকর্ষণ দুর্দমনীয়। তবুও তাঁদের মধ্যেও মণিবউদি অপরাজিতা বিশেষণ-সমন্বিতা গরিবিনীদের অন্যতমা হয়ে বসেছিলেন এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল, উনি কোন একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেও প্রকাশ করুন যে, উনি আমাকে চিনেছেন। তিনি আমাকে চিনে একটু না-হাসায় আমার আকাদেমি পুরস্কার লাভের গৌরবের স্বাদটুকু লবণহীন বলে মনে হচ্ছিল। অন্য সভা বা অনুষ্ঠান হলে হয়তো নিজেই আমি ওঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে বসতাম—'কি? চিনতে পারছেন না নাকি?'

পুরস্কার পাবার আগে যেতাম না। পরে যেতাম এবং পুরস্কারের ফলকটা হাতে করেই গিয়ে সামনে দাঁড়াতাম। যাতে তিনি আমার এই গৌরব ও সম্মান সম্পর্কে ভুল করবার কোন সুযোগ না পান। কিন্তু এ সভা সাধারণ সভা নয়। মণ্ডপের বেদীর উপর বসে আছেন, ভারতবর্ষের বাণীরূপের প্রতীকের মত উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন। পুরস্কারস্বরূপ ওই ফলকটি আমার হাতে দেবার সময় তিনি এমন দু'তিনটি কথা আমাকে বলেছিলেন যা আমার চিত্ত এবং অন্তরকে একটি মহৎ আবেগে পূর্ণ এবং শান্ত করে দিয়েছিল। এই দুটো কারণই সেদিন বাইরের সকল আকর্ষণের—সে মণিবউদির আকর্ষণের মোহ এবং চাপল্যকেও ঠোঁটে তর্জনী রেখে ভ্রূভঙ্গির শাসনে শাসিত করে রেখে ছিল। নড়াচড়ার উপায়ও ছিল না এবং ওই শাসন আমাকে অচপল করেই রেখেছিল।

নারীর মোহে—সে মোহের মধ্যে কোন কামনা থাক বা না থাক—পুরুষেরা বিধাতার নির্দেশে দু'চার পা বা কদম আদিম নৃত্যছন্দে ফেলে থাকেন; এবং সারা অঙ্গে দুটো একটা হিল্লোলও বয়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের জীবনে বিধাতার এই নির্দেশের চেয়েও কঠিনতর নির্দেশ আছে, সে নির্দেশ তার সমাজের; সে নির্দেশ দৈববাণীর চেয়েও অমোঘ।

সুতরাং বসেই ছিলাম। বার বার তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে নানান জল্পনা করে-ছিলাম। সেও ওই কল্পনাতেই শেষ। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। কারণ অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মণিবউদি বিশিষ্ট মানুষের জনতার মধ্যে যেন মিশিয়ে গেলেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বেরিয়ে যাবার পরই এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সাজানো সভাটার মানুষেরা উঠে মিলেমিশে যেন একটা বিশৃঙ্খল জনারণ্যের সৃষ্টি করে ফেললেন, তার মধ্যে মণিবউদি-রূপা স্বর্ণলতাটি যে কোন সহকারের স্কন্ধলগ্না হয়ে কোন পথে কোন দিকে বেরিয়ে গেলেন, তার আর কোন হদিসই পেলাম না আমি। মনে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই এমনভাবে নিজেকে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমার চোখের আড়াল হলেন মণিবউদি। কিন্তু মণি-বউদির একটা ভুল হয়েছিল। দৃষ্টির বাইরে গেলেই নিজেকে নিখোঁজ করা—অধিকাংশের পক্ষে

সম্ভবপর হলেও কিছু মানুষ আছে যাঁদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। কারণ তাঁরা শুধু রূপ দিয়েই তো চিহ্নিত নন, ষষ্ঠেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার ধ্বনি স্পর্শ এবং গন্ধ—তিন দিয়েও তাঁরাও মানুষের মহলে সুপরিচিত। এসব মানুষের ঠিকানা সকলে জানে। ওই সভার ভাঙা আসরে তখন মাত্র বিশ-পঁচিশজন মানুষ অবশিষ্ট; তাদের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি খানিকটা বিভ্রান্তের মত; ভাবছি, ওই মণি-বউদিরই কথা। এরই মধ্যে কেউ আমাকে বললেন—ও। ওই উনি? Lady in the white—উনি তো মিসেস মুকুরজী? ভারতবর্ষের বৈজয়ন্তীধাম এই দেহলী নগরীতে উনি সুপরিচিতা! ভেরী ভেরী ওয়েলনোন পারসোনালিটি! এই ক'বছর যা ঘুরলেন—বোধ হয় বার পাঁচেক হল—ওয়ার্লড্ টুর হয়ে গেছে। কোথায় না? ইউ-এস-এ থেকে চায়না পর্যন্ত। মিস্টার মুকুরজীর ব্রেনই ছিলেন উনি। এখন তো ওঁর হাতেই সব। যদিও আর বেশী কিছু নেই; যা আছে তা খোসা মাত্র; শাঁস যা ছিল তা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ইট ইজ ভেরী ইজি টু ফাইণ্ড আউট হার অফিস। কিন্তু এনগেজমেণ্ট না করে যাবেন না। দেখা হবে না।

সেই সঙ্গে শুনলাম স্বাধীন ভারতবর্ষের যাঁরা নারীশিরোমণি, সর্বজন শ্রদ্ধাস্পদা—তাঁদের সঙ্গেও মণি-বউদির যোগসূত্র নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। শুধু ব্যবসায়-সূত্রেই তিনি বিশ্বভ্রমণ করেন নি। কালচারাল রিলেশনের তাগিদে এবং প্রয়োজনেও তিনি ঘুরেছেন। সেও ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা থেকে রাশিয়া চায়না পর্যন্ত।

নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি সংকল্প ছাড়ি নি; আমি মুকুরজী এণ্টারপ্রাইজের আপিসের দরজায় বিনা এনগেজমেণ্টেই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কলকাত্তার আপিসের কায়দা তবু দেখাশোনা আছে, দিল্লীর ঘোরালো জাঁকজমক বলতে গেলে সেই প্রথম দেখলাম।

রিসেপসনিস্ট মেয়েটি—বাঙালী মেয়ে। খুব চটপটে, কথাবার্তাও খুব ভাল; ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে মনে হয় এ নিশ্চয় সেই মেয়েটি কথা বলছে, যে রেডিয়োতে খবর বলতে বলতে বলে—'দিস ইজ ওল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো—গিভিং ইউ দ্য নিউজ—'। যার উচ্চারণ ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর শুনতে ভারী ভাল লাগে।

আমার আগে থেকে এনগেজমেণ্ট নেই অথচ আমি দেখা করতে চাই শুনে সে বিচিত্র ধরনে শিউরে উঠে বলে উঠল—মাই গুডনেস! এনগেজমেণ্ট নেই অথচ মিসেস মুকুরজীর সঙ্গে দেখা করবেন!

তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন তাকে আমি আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেবার কথা বলেছি।

ইচ্ছে হল বলি—দেখ মেয়ে, বেশী ন্যাকামি ক'র না। খবরটা দিয়ে দেখই না। ১৯৪২ সালে একদিন রাত্রে তোমার বস চাঁদ পেড়ে আমার কপালে টিপ পরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখে আমি বলেছিলাম—অনুগ্রহ করে খবরটা বা একটা স্লিপ তুমি পাঠিয়েই দাও না।

তা অবশ্য করতে হল না। তার আগেই ভেতর থেকে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সেই

পুরাতন কমলকুমার।

বেশ একটু দীর্ঘ এবং রূঢ় পদক্ষেপে সে বেরিয়ে এসে চলে যাচ্ছিল, যেন কোন উত্তপ্ত বাতাবরণ থেকে উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতেই সে আসছিল; শুধু পদক্ষেপের শব্দ এবং ভঙ্গিই নয়, তার মুখ-চোখের থমথমে ভাবও সে কথা বলে দিচ্ছিল। সে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল—আপনি?

আমি বললাম—হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।

—কার সঙ্গে? ওই নটোরিয়াস উয়োম্যানটির সঙ্গে।

কথাটা শুনে ধাক্কা খুব খেলাম না কিন্তু কমলকুমারের মুখে কথাটা ভাল লাগল না। মানালো না।

ঝট করে মুখে আপনি এসে গেল—এখানে আর চাকরি কর না, মনে হচ্ছে। কি করছ?

—করছি অনেক কিছু। কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে কেন?

—বললাম তো বউদির সঙ্গে দেখা করব। অনেকদিন দেখা হয় নি—।

—বউদি? আশ্চর্য এক তিক্ত হাসি ফুটল কমলের মুখে। বারদুয়েক বেশ সরস ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বললে—বউদি? বউদি? হায় হায় হায়! ওই মহিলাটি?

সবিস্ময়ে বললাম—কি বলছ?

—কি বলব? ঠিক বলছি। বলছি—উনি কারুর বউদি নন। যেকালে ছিলেন—ছিলেন। এখন নন। এখন আবার—। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—কাকার মৃত্যুসংবাদ জানেন তো?

—না। শুনি নি। তবে সেদিন সভায় ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল কথাটা।

কমল বললে—সেও এক কেলেঙ্কারি মৃত্যু। সুইসাইড।

—সুইসাইড?

—হ্যাঁ। তিনি সুইসাইড করেছিলেন—ইনি পঞ্চাশ বছরের ধিঙ্গী বিধবা মাগী—সী ইজ গোয়িং টু ম্যারি এগেন। অমৃত মুখুজ্জের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে নেত্য করছেন। বিধবা বউমা তাঁদের 'করবেন বিয়ে, হবে ছেলে, স্বর্গে যাবেন পিণ্ডি পেলে।'

—কমল!

কমলের পিছনের দরজাটা খুলে গেল এবং সে খোলা দরজায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন মণি-বউদি—না মিসেস মুকুরজী। মুকুরজী এণ্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কমল ঘুরে তাকাল। এবং চুপ করে গেল তার মণি-খুড়ীকে দেখে।

মণি-বউদি আমাকে দেখেও আমার সঙ্গে কথা না বলে কমলকেই বললেন—আমার অপিসের মধ্যে তুমি অন্তত শীলতা রক্ষা করে চলবে বলে আশা করি। না চলাটা নিরাপদ হবে না তোমার পক্ষে।

কমল একমুহূর্তে যেন দেখতে অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন হয়ে গেল। সে একটা প্রায় অশ্রাব্য কথা বলে হন হন করে নেমে চলে গেল। মণি-বউদি একটু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা

জানিয়ে বললেন—আমার মনে হয়েছিল আপনি আসবেন।

* * *

ওঁর আপিস ঘরের পাশেই একটি ছোটখাটো বিশ্রাম-কক্ষ। একেবারে আধুনিক ছাঁদে সাজানো। যে ধরনের সাজানো ঘর সচরাচর বিলিতী অথবা ইংরিজী সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের পাতায় ফটো ব্লকে দেওয়া বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখতে পাই—সেই ধরনের। কলকাতায় এমন সাজানো ঘর নেই এমন কথা বলব না, তবে সে সব অঞ্চলে তখনও (অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে) আমার যাতায়াতের 'ভিসা' ঠিক ছিল না। কাঠের কারবারটা সেখানে বেশী। যাক বর্ণনা করতে যাব না, তাতে আমাকে বিপন্ন হতে হবে।

মণি-বউদি সেই ঘরে আমাকে বসিয়ে বললেন—বসুন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। আজও তাঁর প্রায় সেই সেদিনের মতই সাজসজ্জা বেশভূষা। একটি সাদাসিধে নিরাভরণতার আবরণ আশ্চর্য এক উজ্জ্বলতা এবং দীপ্তিকে অত্যন্ত অনায়াস সহজ ছন্দে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে রেখেছে। অর্থাৎ মনেই হয় না যে, ইচ্ছে করে সযত্নে সুকৌশলে কেয়ারফুল কেয়ারলেসনেসের মত এটাকে কেউ গড়ে তুলেছে। যত্নের চিহ্নটা আদৌ ধরা পড়ে না। বর্ষাকালে জঙ্গুলে শ্বেত কাঞ্চনের অজস্র সাদা ফুলে ভরা লম্বা এবং রোগা গাছটির মত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

* * *

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দামী সিগারেট ডি মুরিয়ারের লাল রঙের টিন বের করে সামনে ধরে বললেন—খান।

কর্কটিপ্‌ড্‌ সিগারেট ; ভারি ভালো সিগারেট। উনি নিজেই লাইটার জেলে সিগারেটটার সামনে ধরে বললেন—ভারী ভাল সিগারেট। যাদের এ্যাজমা আছে তারা খেলেও টান ধরে না।

একটু পর বললেন—অনেকগুলো টিন কিনে স্টক করে রেখেছিলাম। নিয়ে যাবেন ?

আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম এই জন্যে যে, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর এই তাঁর সঙ্গে—ব্যাকরণমতে চতুর্থবার দেখা নইলে বলতে গেলে এই দ্বিতীয়বার দেখা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে এবং সেদিন আকাদেমি এ্যাওয়ার্ড প্যাণ্ডেলে দুবার চোখোচোখি হওয়াটাকে ঠিক দেখা হওয়ার সামিল না ধরলেও কিছু যায়-আসে না। এই সত্য বা তথ্যটি মানুষের জীবনে অনেক কিছুর কারণ হতে পারে। অনেক প্রশ্ন অন্ততঃ আমার মনে জমা হয়েও ছিল এবং ভিড় করে বের হবার জন্য ঠেলাঠেলিও করছিল। কিন্তু মণি-বউদি আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে এমন সহজ ছন্দে একটি লোহার ফটক টেনে বন্ধ করে দিলেন, যে প্রশ্নোত্তরের পালায় মুহূর্তে ছেদ পড়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তাঁর সেই সহজ ছন্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বময়ী বিলাসিনী রূপটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনের প্রশ্নগুলো বোবা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

মণি-বউদি, পুরানো কথা এবং পুরানো কালের সব অভিযোগ অনায়াসে এড়িয়ে গিয়ে ডি-মুরিয়ার সিগারেট প্রসঙ্গ তুলে কথা বলে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্য থেকে হঠাৎ এক সময়

বলে বসলেন—উনি শেষটায় এত বেশী ড্রিঙ্ক আর স্মোক করতে ধরেছিলেন যে, হাঁপানীর টান হ'ত। ডাক্তারেরা ওগুলো ছাড়তে বলেছিলেন, তা হেসে আপনার দুই পুরুষের সুশোভনের কথা কোট করে জবাব দিয়েছিলেন, ওরে বাবাঃ, তাহলে বাঁচব কি খেয়ে মুট্‌দা। শেষে ডাক্তারেরা প্রেসক্রাইব করলে মারটেল ব্র্যাণ্ডি আর ডি মুরিয়ার সিগারেট। সে-সময় আমিও খেয়েছি।

চমকে খুব উঠলাম না। কারণ শুভ্রবসনা স্থিরযৌবনা মণিবউদির হালের রূপের মধ্যে যে দীপ্তি ঝিলিক মারছে তাতে সিগারেট না খেলেই বেমানান হবে। ভারতবর্ষে যাঁরা বর্তমানে গরীয়সী মহিলা, তাঁদের এক হাতে পানীয়ের গ্লাস এবং অন্য হাতে লম্বা পাইপে সিগারেট—নইলে রূপে সম্পূর্ণই হন না। অবশ্য সবাই নন।

হঠাৎ কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন মণি-বউদি।—ওঁর মৃত্যুর খবর জানতেন না, না?

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বিষণ্ণ হেসে বললেন—কেলেঙ্কারির দায়ে খবরটা চেপে যেতে হয়েছিল। সুইসাইড করলেন; একটা কিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারি করলেন যে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করতে হ'ল। সেও বিদেশে। সেটাও একটা সুবিধে হয়েছিল, এখানে ব্যাপারটা পাব্লিসিটি পায় নি।

একটু আগেই কমল বলে গিয়েছিল, সেও এক কেলেঙ্কারির মৃত্যু, সুইসাইড। সুতরাং বিস্ময়ের ধাক্কা আসেনি তাতে। কিন্তু ফিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে 'এমন কেলেঙ্কারি' কথাটুকু বিস্ময় নিয়ে এল অনিবার্যরূপে।

মনের মধ্যে মাছি আছে। সে মাছি ফুলের মধুও পান করে, আবার সেই মাছিই নর্দমায় বসে পরমানন্দে পঙ্করসে ডুবে থাকে। মনের সেই মাছিটা পাখা মেলে উড়তে শুরু করলে—ওই ফিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে অমৃতবাবুর কেলেঙ্কারির পঙ্করসকুণ্ডের সন্ধানে।

—আমি বারণ করেছিলাম ওঁকে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মণি-বউদি। একটা সত্যকারের বিষণ্ণতা যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘরের বায়ুমণ্ডলে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে অনুভব করলাম তার স্বাদ।

—খুব সুখের জীবন ছিল আমার। একটু থেমে আবার বললেন—জীবনের ছেলেবেলা থেকে কখনো হারি নি আমি। কক্ষনো না। সেই বিহারশরীফ থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত, কোথাও না।—হেরে গেলাম দিল্লীতে এসে।

আবার একটু চুপ করে যেন ভেবেচিন্তে নিয়ে বললেন—প্রথমটা বুঝতে পারি নি যে হারছি। মনে হয়েছিল জিতছি। সে-জেতা এমন-তেমন নয়। যেন দিন-দুনিয়া জিতে নেওয়া। কিন্তু আসলে যে পায়ের তলার মাটি সরে সরে ডুবে যেতে বসেছি, তা বুঝতে পারি নি।

—হঠাৎ একজন কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মানে য়্যাকসিডেণ্টাল নয়; সে রকমটা উপন্যাস গল্পে দেখা যায়। যা থেকে রোমান্স হয়। তা নয়। সহজ পথে আলাপ হল। ব্যবসার পথে। কর্ণেল সাহেবটির হাতে ছিল সরকারী দিকটার কর্তৃত্ব। টেণ্ডার

স্যাংশন করবার একটা কমিটি আছে, কিন্তু সে-ই সব। তারপর মাল দেখে নেওয়া—সেও তাঁর হাত। বিল পাশ করে অন্য লোক কিন্তু সেখানেও এঁর হাত।

একটু হেসে বললেন—এতগুলো ব্যাপার যাঁর হাতে এবং মাথায়, সে মানুষটার দশটা মাথা কুড়িটা হাত বাইরে থেকে দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে থাকেই। যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে দেখতে পায়ই।

সে অন্তর্দৃষ্টি উনি ব্যবসা করতে শুরু করে অর্জন করেছিলেন। এককালে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন; দেশপ্রেমিক কুমার-ব্রতধারী মানুষটির কপালে একসঙ্গে জমে উঠল ব্যবসা আর প্রেম। যে-ডাঙ্গাটা নিয়েছিলেন তুলোর চাষের জন্য সেখানে কপাল-গুণে বেরিয়ে গেল ফায়ার ক্লে; আর এক ডাক্তার ভদ্রলোকের মৃত্যুশয্যায় দায়ে পড়ে নিজের কন্যার বয়সী, তার যে কিশোরী মেয়েটিকে একান্ত ভাবে স্নেহবশে নিয়ে এলেন, সে যুবতী হয়ে তাঁর গলায় মালা দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলে, এও তাঁর কপাল-গুণ ছাড়া আর কি বলুন। বোধ করি সেই কপালচক্রেই উনি পাকা ব্যবসাদার হয়ে উঠে এ অন্তর্দৃষ্টিটুকু অর্জন করেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন—মণি, এ লোকটা একটা জাত হাঙ্গর, ব্যাটার দাঁত যত ধারাল, পেট তেমনি অভর। তবে গাঁথতে পারলে অনায়াসে ওর তেল নিঙরে বের করে নেওয়া যায়।

সেই তেল নিঙড়ে নিতে গেলেন। একজন সুন্দরী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে স্টেনোর চাকরি দিয়ে এনে তার সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি করে বললেন—সায়েবকে পাকড়াতে হবে।

টোপের আগে চারের ব্যবস্থা।

সে ব্যবস্থা খানা-পিনা-ডিনার-ড্রিঙ্ক।

বলতে পারব না, কি করে এসব তিনি পারলেন, কি করে তাঁর মনে এত সায় দিলে! একদিন তো উনি সত্যিকারের নীতিবাদী খাঁটি মানুষ ছিলেন।

হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ, প্রায় মিনিট খানেক, চুপ করে বোধ হয় ভেবে নিলেন, এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—এক-এক সময় আমার নিজেকেই দায়ী বলে মনে হয়। আমার রূপ-যৌবনের লোভেই তিনি পা পেছলালেন। মাসীর প্রেম তার পড়ন্ত যৌবনের সঙ্গে-সঙ্গেই বাসী হয়ে গেল। সে আমার জন্যেই। এবং আমিই তাঁকে টেনে-ছিলাম।

আবার হেসে বললেন—অবশ্য বাস্তব দুনিয়ার শক্ত মাটিতে হুঁচোট খেয়ে খেয়ে সেন্টিমেণ্ট আর প্রায় অবশিষ্ট নেই বললেই হয়, তবুও মধ্যে মধ্যে এই ধরনের ইমোশন বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চায় এবং ওঠেও সময়-সময়। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ইমোশনের মধ্যে সত্যি কিছু নেই। ওতে পেট ভরে না। ওর ফুডভ্যালু নেই, তৃষ্ণার জলও নয়। কিন্তু ওতে একটা নেশা আছে। মদের নেশার চেয়েও গাঢ় একটা নেশা হয়। উনি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মধ্যে মধ্যে কাঁদতেন—মণি, আমি-আমি-আমি সব কিছুর জন্যে রেসপনসিবল। আই অ্যাম রেসপনসিব্‌ল! মণি, তুমি আমার পবিত্র মণি।

সে শুনে না-হেসে পারতাম না।

হাসলে আবার রাগ করতেন। কিন্তু যে-দিন মদ না খেয়ে নিছক ইমোশন-বশে কাঁদতেন সেদিন আমাকেও কাঁদতে হত। দুজনে দুটো ঘরে শুয়ে-শুয়ে কাঁদতাম। এ কি হল? কেন এমন হল? কিন্তু কি করব? এই যে চলতে-থাকা দুনিয়া, এ বড় কঠিন; এক দণ্ড, কি এক মুহূর্ত থামে না। ইট নেভার স্টপ্‌স্। আমার আপনারও থামবার অবকাশ নেই। সেই চলার টানে আমরা চলি। পুরোপুরি ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাপার, ইমোশনাল নয়; কিন্তু তবু ইমোশন আছে জীবনে। অন্ততঃ একাল পর্যন্ত তো আছে।

* * *

একটু থেমে হয়তো কিছু ভেবে কিম্বা দম দিয়ে বললেন—কি আর বলব বলুন। কালের এমন একটা প্রবল স্রোত, যা হাজার হাজার নায়াগ্রা ফল্‌সের চেয়েও প্রবল! কথাটা উনি বলতেন। বলতেন, এই যে কালটা, এই যে ওয়ার, এর যা স্পীড, এর যা মোমেণ্টাম, এতে গোটা পৃথিবীর ম্যান, মেটিরিয়েল, একেবারে জল আর কয়লার মত বয়লারের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হিটলারের মত শক্তি উড়ে গেল, জীর্ণ খসে পড়া পাতার মত। তো আমি।

বলতেন—না দুঃখ আমার নেই। আই হ্যাভ টেস্টেড এভরিথিং।

দুঃখ করতেন আমার জন্যে।

বলতেন—কিন্তু আপসোস, তোমাকে কেন এর মধ্যে টানলাম মণি?

আমি সান্ত্বনা দেবার মত কথাও খুঁজে পাই নি। কমল-টমলের কাছে ডিটেল্‌স্ শুনতে পারেন। আরও অনেকের কাছে পাবেন। ওরা সব দেখেছে। চোখ দিয়ে দেখে যা বোঝা যায় যতটুকু ধরা যায় তার রেকর্ড আছে তাদের কাছে। কিন্তু তার মানে ওরা ঠিক জানে না। আমিও ঠিক বলতে পারব না। এখনও আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে আসে নি। উনি সুইসাইড করেছেন। আমি তা করি নি। যত কলঙ্ক, যত অপবাদ মাথায় করে নিয়েছি। মাথায় করে কেন? সাপের মত আমার দেহটা জড়িয়ে রেখেছে। আগেকার আমলের আমি হলে আমিও বোধ হয় সুইসাইড করতাম। কিন্তু এই দশ-বারো বছরে জীবনে অনেক ঢল নেমে বয়ে গেল ঠাকুরজামাই। যে মণি-বউদি হাতীপাঞ্জাপেড়ে শাড়ী, পুরনো আমলের ঢঙে ঢল্‌কো করে পরে কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে গণক দৈবজ্ঞদের কাছে যেত, সে মণিমালা একেবারে পাল্টে গেছে। এ বারো বছরের চার-চার বার ফরেন টুর করে এসেছে। দুবার কন্টিনেন্ট ঘুরেছে; একবার সারা পৃথিবী। রাশিয়া চায়না তাও গেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে? বাইরের চেহারার সঙ্গে তার অনেক গরমিল।

কমল এখুনি খুব রূঢ়ভাবে তর্জনী উদ্যত করে শাসিয়ে গেল। নালিশ করবে। অমৃতবাবুর ধর্মভ্রষ্টা নীতিভ্রষ্টা পত্নী হিসেবে আমার জাত গেছে, কুল গেছে, সব গেছে; সুতরাং অমৃত-বাবুর যে উত্তরাধিকারে আমি অধিষ্ঠিতা রয়েছি, তা থেকে আমাকে হটে যেতে হবে। আই মাস্ট কুইট।

অবশ্য তার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করলে আলাদা কথা।

শর্ত মাত্র তিনটি।

আমি তাকে ভজবো—নাম্বার ওয়ান।

নাম্বার টু হল, একখানি কাগজে সই করে দিতে হবে। যে কাগজের লেখাগুলি অর্ধ সত্য অথবা বাইরে সত্য, ভিতরের প্রশ্নই নেই—সে কাগজখানা তার হাতে থাকবে আমার মৃত্যুবাণ হিসেবে।

তিন নম্বর হল—লছমন প্রসাদকে যেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম এই বারো-চৌদ্দ বছরে আমূল পরিবর্তিত হয়ে-যাওয়া মণি-বউদিকে।

এতটুকু মিল নেই। মাঝে-মাঝে জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তার মধ্যে ১৯৪২ সালের সেই রাত্রের জীবনকাহিনী বলা মণি-বউদিকে মনে পড়ছিল, তিনিও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে এমনিভাবে তাকিয়েছিলেন মধ্যে-মধ্যে, ঠিক এমনি বা তেমনি উদাসীনতার সঙ্গে।

আমি সিগারেট টেনে যাচ্ছিলাম একটার পর একটা।

সেদিনের পালা প্রায় এইখানেই শেষ হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ছিলাম ওঁর কাছে, বার দুয়েক কফি খাইয়েছিলেন, তার সঙ্গে বাদাম বিস্কুট ছিল, তার বেশী কিছু না। ফিরে আসার সময় সিগারেটের টিনটা নিতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি নিই নি।

এক বছর পর মণিবউদি টেলিগ্রাম করলেন, একবার আসতেই হবে। শেষ অনুরোধ। কলকাতা অপিসকে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

তেরো

এক বছর পর মণিবউদিকে দেখলাম। দেখে যেন কেমন হয়ে গিছলাম আমি। মণিবউদিকে চিনতে পেরেও মনে হয়েছিল, চিনতে না পারলেই যেন ভাল হত। সবই সেই, (এক বছরে একটা মানুষের আর কত পরিবর্তনই বা হয়, যদি না কোন ব্যাধি থাকে), তবু যেন এমন কিছু ছিল না বা হারিয়েছিল, যাতে তাঁকে না চিনতে পারলেই ভাল হত।

রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর 'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিষ্ঠুর শিশির ঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া' ছত্রটি আজ মনে পড়ছে। মণিবউদি মৃত অর্থাৎ দল ঝরে-পড়া পদ্মের দশায় তখনও উপনীত হননি ; তবে তার কিছুটা আগের দশার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। দল-গুলিতে শুকনো একটা স্পর্শ লেগেছে, বৃন্ত শিথিল হয়েছে, গন্ধে বিষণ্ণতা এবং বিকৃতি এসেছে, রঙ বিবর্ণ হয়েছে ; মৃদু বাতাসে এমনভাবে দুলছে যে মনে হয় বাতাসের মধ্যে একটু ঝড়ো আমেজ লাগলেই দলগুলি ঝরঝর করে ঝরে পরে যাবে, বা গেলেই ভাল হয়।

মণিবউদি সেই জানালাটার ধারেই একখানা কুশন-দেওয়া চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন ;

ঠিক পড়ছিলেন না, তিনি বইখানার মধ্যে আঙুল পুরে ধরে বসে ছিলেন—আমারই অপেক্ষা করছিলেন।

তার আগে বলে' নি, দেখা তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লীতে আমার হয়নি; দেখা হয়েছিল কলকাতায়। আপিসের লোক এসে জানিয়েছিল যে, দিল্লী আর আমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না; কারণ, মালিক কলকাতাতেই আসলেন। এসেই উনি আমাকে খবর দিয়েছিলেন।

খবর একখানি ছোট্ট চিঠিতে পাঠিয়ে ছিলেন, চিঠিখানা নিয়ে এসেছিল সেই লছমনপ্রসাদ। যে একদা মণিবউদির মাসীর বাড়ীতে বয়চাকর ছিল এবং যে ছেলেটি কিশোর বয়সের আবেগে বা মনোধর্মে একটি কিশোরী মেয়ের নির্যাতন দেখতে না পেরে তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল, আপনার মনের নির্দেশেই সকল খবর পৌঁছে দিয়ে এসেছিল—ঠিক স্থানটিতে অর্থাৎ অমৃতবাবুর কাছে। এবং যে লছমনপ্রসাদ পরবর্তী জীবনে অমৃতবাবু ও মণিবউদিদের ব্যবসায় সংস্রবে থেকে একজন কৃতী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে আজ, সেই লছমনপ্রসাদ। দিল্লীর কথাপ্রসঙ্গে আমার বলা উচিত ছিল যে, সেখানে আমি লছমন প্রসাদকে দেখেছিলাম। চুস্ত পায়জামা এবং দামী শেরওয়ানীতে তাকে শুধু একজন রইস আদমী বলেই মনে হচ্ছিল, না, মনে হচ্ছিল লছমনপ্রসাদকে কোন নেতৃত্বের আসনে বসালেও এতটুকু বেমানান দেখায় না। এবং লছমন তাতে অপারঙ্গমতার লজ্জায় লজ্জিতও হবে না।

থাক, লছমনপ্রসাদের কথা থাক।

চিঠিখানায় লেখা ছিল, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে মুছে ফেলে শ্রদ্ধাস্পদেষু সম্বোধন করলাম। আমি কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। কাজটা দিল্লীতে হয়ে উঠল না; এখানেই আসতে হল। আপনার একটু সাহায্য ভিক্ষা করছি, কোন সম্পর্ক ধরে নয়; পরিচয়ের দাবীতে। একখানা দলিলে আপনাকে সাক্ষী হতে হবে। আর কিছু না। বিকেলে একবার দয়া করে এলে খুব খুশী হব। ইতি মণিমালা দেবী।'

মণিবউদির বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম—উনি উপরে আছেন এবং আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। দোতলার সেই ঘরে তিনি সেই জানালাটার ধারে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, যেটা দক্ষিণ দিকের জানালা এবং যে জানালাটার ধারে বসে একদা ১৯৪২ সালের ব্ল্যাক-আউটের রাত্রিতে তিনি সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে আমাকে তাঁর জীবনের কথা বলেছিলেন। তাঁর পূর্ণযুবতী, রুচিবাদিনী, শিক্ষয়িত্রী মাসীকে বয়সে কিশোরী, পশ্চিমের দেহাতী-রুচিসম্পন্না তিনি কি বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিলেন সেই বিচিত্র কাহিনী বলেছিলেন, ঠিক সেই জানালার ধারেই আজ তিনি যেন যৌবনের পশ্চিম সিংহদ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে অপরাহ্ণের লালচে রৌদ্র মেখে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই একটু ম্লান হেসে বললেন—আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি।

চট করে মনের মধ্যে একটা গানের লাইন ভেসে এল—'কালা তোর তরে কদমতলায়

চেয়ে থাকি/পথের পানে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার কাজল-পরা জোড়া আঁখি।'—কিন্তু ওঁর দিকে তাকিয়ে সেকথা যেন একটা আঘাত খেয়ে থমকে বোবা হয়ে গেল। ওঁর এই ছবিটি আমার মনের পর্দায় ছাপ ফেলতেই কথাগুলি জিভের মধ্যে লজ্জা পেয়ে তখন গুটিয়ে গেল।

তার বদলে মনে পড়ল কথা ও কাহিনীর ওই ছত্রটি। 'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।' আগেই বলেছি যে, আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। ঠিক তেমনি শুকনো শুকনো লাগছিল। অথচ শরীর শীর্ণ হয়নি; প্রসাধন বা সাজসজ্জারও যে অভাব ছিল, তা ছিল না। চুলগুলি রুখু, সে স্যাম্পু-করা রুখু বলেই মনে হল। খসখসে কালো চুলের মধ্যে মধ্যে রূপালী চুলের দু-চার গাছা বা এক-আধ গুচ্ছ ঝিকমিক করছিল; মুখের উপর পাউডারের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণও ছিল, মণিবউদির গৌরবর্ণের গৌরবের মধ্যেও কোথাও দাগ পড়েনি, তবু যেন একটা ছায়া পড়েছিল কিছুর; সব থেকে শুকনো মনে হচ্ছিল ঠোঁটদুটি, এখানেই অভাব ছিল প্রসাধনের; দেখলাম মণিবউদি লিপস্টিক মাখেননি। শীত-শীর্ণ পদ্মের সঙ্গে মিলটা যেন এইখানেই সব থেকে বেশী ছিল।

না।

আরও এক জায়গায় ছিল। চোখের চাউনিতে। অর্থাৎ দৃষ্টিতে। হয় বিমর্ষতা, নয় হতাশা, দুটোর একটা অথবা দুটোই—একসঙ্গে মিলিতভাবে মণিবউদির সেকালের সকল তারুণ্য ও দীপ্তির উৎস তাঁর আয়ত চোখের কালো তারাদুটিকে যেন কেমন নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল।

আমি একটু বিস্মিত হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

তিনি বললেন—বসুন। সামনের সোফাখানা দেখিয়ে দিলেন।

বসলাম। বসে বললাম—এক বছরে—

—হ্যাঁ। অনেক ঝড়জল মাথার উপর দিয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন—সেই মামলা। আপনি যেদিন গিয়েছিলেন দিল্লীর আপিসে সেদিন কমল আমাকে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। আপনাকে বলেছিলুম বোধ হয়।

বললাম—হ্যাঁ।

—তারপর ওরা মামলা দায়ের করেছিল। বেশ কিছুটা দূর এগিয়েও ছিল। তারপর আর ভাল লাগল না।

একটি বিচিত্র হাসি—যে হাসির মধ্যে কান্নার ইশারা উঁকি মারে, দুঃখের কথা মনে পড়ায় যে-হাসি, এ-হাসি সেই হাসি; তিনি বললেন—

সইতে এমনিই পারছিলাম না। তাই মিটমাট করে ফেলছি।

কোন্ কথা আমি খুঁজে পাইনি, কি বলব? মনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক শোনা কথা এবং বিশ্বাস ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছিল তাদের প্রত্যেকেরই বলবার কথা অনেক ছিল। এই এতদিন অর্থাৎ ১৯৪২ সালের শেষ ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬। '৫৫ সাল পর্যন্ত অমৃতবাবু এবং মণিবউদির ভাগ্য সম্পর্কে কম কথা তো রটেনি; সে-সব অনেক কথা। গুজবে কান দিতে

নেই কথাটা 'সদা সত্য কথা বলিবেন' জাতের একটা কথা। গুজবের জন্য কান উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এবং মুখরোচক গুজবকে আরও কিছু মুখরোচক করে তোলার কাজটা মনে মনেই হয়ে থাকে। সুতরাং তার পর একেবারে হাঁ-হা করে ওঠারই কথা। কিন্তু মণিবউদির মুখের দিকে তাকিয়ে তারা চুপ করে গেল। সেখানে সেদিন সেই মুহূর্তটিতে শুধু বিষণ্ণতা বিমর্ষতা বেদনার্ততাই ছিল না। আরও কিছু ছিল। যা ছিল, তা অসাধারণ কিছু। একটা কঠিন দৃঢ়তা ছিল। বিশ্বসংসারকে উপেক্ষা করার একটা দৃপ্ততা ছিল। সেটা সেই মুহূর্তে যেন ছ-ব্যাটারী টর্চের আলোর মতো জ্বলে উঠেছিল। বা কোন মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ-সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরে দিগন্তের বিদ্যুচ্চমকের মত চমকে উঠেছিল বারেকের জন্য।

ঠোঁটদুটি তাঁর বেঁকে গেল, মুখে চোখে যেন ঘৃণা উপচে পড়ল। বললেন—ঘেন্না হয়ে গেছে আমার।—জানেন, সংসারে দেহের সত্যিকারের দাম বোধ হয় শকুনি শেয়াল ছাড়া অন্যে বেশী জানে না। কিন্তু তারাও জ্যান্ত মানুষকে ছিঁড়ে খায় না। মানুষ তার থেকেও জঘন্য, আর সেইজন্যেই যে দেহটার প্রতি যত বেশী অনুরাগ, কুৎসিত কালো কালি তত বেশী করে সেই দেহটার সারা অঙ্গে লেপে দেয়।

হেসে বললেন—এও এক ধরনের পূজো, বুঝলেন না? কিম্বা এক ধরনের ভোগ করার স্যাটিসফ্যাকশন।

এই হাসির সময়টুকুর অবসরে একটি বিচিত্র সত্য আবিষ্কার করলাম: আবিষ্কার করলাম, মণিবউদির সেই সামনের ঈষৎ উঁচু দাঁতদুটি ঠিক তেমনিভাবেই উঁচু এবং চকচকে থাকা সত্ত্বেও সেই দেখনহাসি রূপটি তাঁর চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।

* * *

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে কমলকুমার প্রমুখ জনকয়েক বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। দাবী—"অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী বলিয়া বর্ণিত শ্রীমতী মণিমালা দেবী তদীয় স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব হইতেই স্বকীয় ভ্রষ্টাচার ও নীতি-বিগর্হিত আচার-আচরণের জন্য মৃত অমৃতলাল দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। এবং অমৃতলাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একজন শ্বেতাঙ্গ কুমারীকে রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই, নতুবা তাহাই করিতেন। এবং প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মণিমালা দেবী ১৯৪৩ সাল হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অজুহাতে নানান জনের সহিত মেলামেশা এবং স্বেচ্ছাচার করিয়া আসিতেছেন একেবারে স্বৈরিণীর মত। ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালে সারা পৃথিবী জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং নানান কেলেঙ্কারি করিয়াছেন। লিখিত চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ সমস্তই বাদীপক্ষের হাতে মজুত আছে। অমৃতবাবু শেষজীবনে এইসব কারণে এই স্ত্রীকে বর্জন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করিয়াও, আকস্মিক মৃত্যু হেতু তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

"এইসব কারণে বাদীপক্ষের প্রার্থনা, এই ভ্রষ্টা নারীকে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়-পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হোক। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ভ্রষ্টা নারীর জাতিপাত

হইয়া থাকে বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সুতরাং সেই অনুযায়ী ধর্মত্যাগিণী জাতিচ্যুতা বিবাদিনীকে মৃত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়-পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হউক এবং সেই অধিকার তাঁহার ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণ এই বাদীগণের অনুকূলে ডিক্রী দেওয়া হউক।"

তার উত্তরে যে-জবাব দেওয়া হয়েছিল, সে-জবাব পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ওখানে বসেই কথাপ্রসঙ্গে এইসব বিবরণ মুখে বলতে বলতে, কি তাঁর ইচ্ছে হল জানি না, তিনি এক সময় বললেন—দাঁড়ান, আসছি, এক মিনিট।

উঠে গিয়ে অন্য ঘর থেকে মামলার নথির নকল এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখুন। মুখে আর কত বলব ?

পড়ে দেখে, আগেই বলেছি, স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মুখে তো অনেকটাই বলেছিলেন। কমলকুমারদের দল, ব্যবসায়ের অজুহাতে যে-সব বিদেশীদের সঙ্গে মণিমালা দেবী অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছিলেন এবং লছমনপ্রসাদের মত যে-সব অনুগতের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন, তাদের নাম স্বচ্ছন্দে মুখে এনে এই জবাবের বেলায় নথিটা কেন এনে দিলেন তা বুঝতে আমি পারিনি।

নারী রহস্যময়ী। তার চরিত্র তার নিজের কাছেই দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্ভেদ্য, এছাড়া আর কোন কৈফিয়ৎ আমি খুঁজে পাইনি।

জবাবের দুটো দিক ছিল।

প্রথমটা হল এই যে, এই সম্পত্তি একক অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের ছিল না। তাতে মণিমালা দেবী স্বকীয় পৈতৃক অর্থমূল্যে ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছিলেন। বিস্তৃত বিবরণের একটা সারাংশ দেওয়া ছিল। মণিমালার বাপ যে ক্যাশ-সার্টিফিকেট রেখে গিয়েছিলেন, সেই টাকাটা চুরি গিয়েছিল বলে যে পুলিশ-কেস হয়েছিল তা সত্য নয়। অমৃতবাবুই কৌশলে সে টাকা ও গহনা হস্তগত করেছিলেন। এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই অমৃতবাবু নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বাজারচলিত সুদ দরেই ধার নিয়ে নিয়োগ করেছিলেন। এবং বৎসরান্তে সুদ হিসাব করে সেই সুদটাকে আসল হিসাবে নিয়োগ করে এসেছিলেন নিয়মিত-ভাবে। এইভাবে টাকাটা ক্রুদ্ধ বিন্ধ্যের মত মাথা তুলে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। যখন যুদ্ধের সময় নতুন করে বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামলেন অমৃতবাবু তখন সমস্ত নিরাপদ ব্যবসায়গুলির মালিকানা দিয়েছিলেন মণিমালাকে।

জবাবে সেই কথাই বেশ বক্রভাবে ধারালো করে জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল—মণিমালা দেবী এই সকল সম্পত্তিতে অমৃতলালের উত্তরাধিকারিণী স্ত্রী হিসাবে যেমন মালিক, তেমনি মালিক তিনি তাঁর স্বকীয় অধিকারে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছিল—এই সকল ব্যবসায়ের কর্ম-পরিচালনাকল্পে মণিমালা দেবী আজ বারো বৎসর ধরে যে স্বাধীনভাবে নানান জনের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তা স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের কালেই করেছেন এবং তাতে স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায়ের কোন

আপত্তিরই কারণ ঘটেনি।

আরও অনেক কথা। যার মধ্যে কোন অনাচার বা কদাচার বা জাতিপাতের মত ব্যভিচার করেন নি, এই প্রতিবাদটা উচ্চ নয়—উচ্চ হয়ে উঠেছে এই কথাটা যে মণিমালা যা করেছেন, তা অমৃতলালের জ্ঞাতসারেই করেছেন। ওই যে একটি বিদেশিনী মেয়েকে নিয়ে শেষবয়সে অমৃতবাবু মাতামাতি করেছিলেন, সে কথার উল্লেখ করেও যেন বলতে চেয়েছেন যে, একটা বোঝাপড়া করেই যেন এমনটা হয়েছে। যার যা মন চায় সে তা করেছে। জীবনের চুক্তির আসল অর্থও ঠিক এইরকম।

সেই কারণেই অমৃতবাবু উইলের কোন পরিবর্তন করেন নি। বন্ধ্যা হলেও তাঁকেই দিয়ে গেছেন তাঁর স্বকীয় সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার।

তার উপর বর্তমানকালে হিন্দু কোড বিলে যে-বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে—সে-বিচারেও এই ধরনের কোন আপত্তিকর দাবী উত্থাপনের অধিকার বাদীদের নেই।

তারপর যথানিয়মে এই মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে আদালতের সকল খরচ, যা তিনি বাধ্য হয়ে করেছেন, তা, বাদীদের কাছ থেকে আদায় পাবার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

কাগজ থেকে মুখ তুলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন না, জানলা দিয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন নিবিষ্টচিত্তে, একেবারে যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি মুখ তুলে তাকালাম, তিনি বুঝতে পারেন নি। বাধ্য হয়ে একটু সাড়া দিলাম। তিনি ফিরে তাকালেন। চোখোচোখি হতেই কাগজগুলি সামনে নামিয়ে দিয়ে বললাম—মিটিয়ে ফেলছেন?

একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। তবে সে কম্প্রোমাইজ নয়; দিল্লীতে কমলের দেওয়া যে টার্মসের কথা বলেছিলাম আপনাকে, তা নয়।

এর কোন জবাব দিলাম না, চুপ করে রইলাম। কি জবাব দেব?

উনি বললেন—সব ছেড়ে দিচ্ছি ওদের। বড় ঘেন্না করছে—এইসব নিয়ে প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্ন, জেরা করতে।

বুঝতে পারলাম। উকীল ব্যারিস্টারের কুটিল প্রশ্নজালের মধ্যে অসহায়া হরিণীর মত পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরণাপন্ন হয়ে উঠেছেন, তা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন।

কিন্তু না। সে-কথা উনিই বললেন—দেখুন ভয় আমি পাইনি! না। ভয় নয়। আমি শেষ বারো বছর তো সারাদুনিয়া চষে বেড়িয়েছি—সব ঘেঁটে দেখেছি। পাপ বলুন পুণ্য বলুন ধর্ম বলুন অধর্ম বলুন এ-সবের কোন শাসনই আমার উপর কেউ খাটাতে পারে না। আমার সব সংস্কারের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি নিজে। শেষটায় তিনি নিজে—

চুপ করে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেন—নিজে তিনি তাঁর পুরানো কালে পিউরিট্যানি-

জমের ঝোঁক, ছেড়ে দেওয়া নয়, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। লনা মেয়েটা এক-পুরুষে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান; মা ওর খাস বিলেতের মেয়ে, এদেশে স্বামীর সঙ্গে এসে বিধবা হয়ে একজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটার রূপ ছিল—তারও ওপরে ছিল আশ্চর্য একটা চার্ম। মোহ। তার সঙ্গে তাঁর কিছুদিন ধরেই দিনরাত্রি দুইই কাটতে লাগল। যুদ্ধের সময়; মেয়েটাকে প্রথমে নিয়েছিলেন টাইপিস্ট হিসেবে, তারপর তাকে করলেন নিজের সেক্রেটারী।

বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন সে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে।

সে-ভঙ্গিতে মানুষ দুটো কারণে ঘাড় নেড়ে থাকে। এক মনে-মনে বুঝে উপভোগ করে ঘাড় নাড়ে, এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আবার ওদিক থেকে এদিক পর্যন্ত। যতক্ষণ মনে-মনে মানুষ এই উপভোগের রতি ভোগ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলে এই ঘাড়নাড়া। আর এক কারণেও এইভাবে ঘাড় নাড়ে—সেটা হল একটি বেদনার্ত আক্ষেপের কারণে।

মণিবউদি কোন কারণে ঘাড় নেড়েছিলেন তা বুঝতে পারিনি। তবে মনে হয়েছিল আক্ষেপেই করেছেন। অমৃতদা মোটামুটি এই অধঃপতনের আগে পর্যন্ত একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল, তাঁর জীবনের দিগন্ত ছিল, যথাসাধ্য সূর্যালোকের দিকেই সামনে ফিরে পথ চলেছেন; দেশসেবার একটি ধর্ম বা পুণ্য এও তাঁর ছিল, এও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই মানুষ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে অকস্মাৎ সব ঝুট হ্যায় বলে সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটির ধুলোর মধ্যে; এবং তার পরিবর্তে কুড়িয়ে নিলেন সংসারের রক্তমাংস ক্লেদ আর বস্তুপুঞ্জের মধ্যে থেকে একটি নারীদেহ ও আসবভাণ্ড। এর জন্য মণিবউদি আক্ষেপ ছাড়া আর কি করতে পারেন? হয়তো সে আক্ষেপ আরও বেড়েছিল—নিজের কারণে। এরই ধাক্কায় তিনিও—

বউদি বললেন—জানেন, বুঝতেই পারিনি। উনিও না। আমিও না। যুদ্ধের চাকায় দুনিয়া এমনভাবে পাক খেতে লাগল যে, কে কখন কোন পাতালে পড়ল বা উঁচুতে উঠল তার হিসেব খুব সহজ ছিল না। যুদ্ধের বাজারে এই ব্যবসাটিকে বিরাট একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে গেলাম আমরা। সুযোগ এসে গেল। ওই কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল। বেশ কল্পনা করে প্ল্যান করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আপিসে স্টেনোটাইপিস্ট লনাকে ব্যবহার করবেন টোপ হিসেবে—তার সঙ্গে বললেন—মণি, তুমি সুদ্ধ দেখ। তুমি তো বোঝসোঝ, লেখাপড়া জান। অন্ততঃ আমার সঙ্গে একটু-আধটু ঘোরাঘুরি কর। তাই করতে করতে কখন যে পা পিছলে গেল ওঁর—।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, মানুষের জীবনে যে সব আমূল পরিবর্তনগুলো হয়, সেগুলো নাটক করে হয় না। আস্তে আস্তে হয়। মানুষ যেমন ভাবে বাড়ে তেমনি ভাবে হয়। লটারীতে টাকা পেয়ে যারা বড়লোক হয়, তাদের কথা ছেড়ে যারাই গরীব থেকে বড়লোক হয় তারা মানুষকে হকচকিয়ে দিয়ে বড়লোকী চাল ধরে না। মোটা কাপড় থেকে মিলের ফাইন কাপড়, তারপর

শান্তিপুরী কাপড় তারপর স্যুটটুট পরে। এবং নিজে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধে তখন আগের দিনের সঙ্গে সেদিনের নিজের গরমিল আদৌ মনে কোন সাড়া জাগায় না। ঠিক সেইরকম হ'ল। বারো বছরের উনি সেই পুরানো কালের স্বদেশী আদর্শের মানুষ, এককাল খদ্দরপরা মানুষ, স্যুট ধরলেন, সিগারেট ধরলেন, তার সঙ্গে মদ।

হেসে ফেলে বললেন, মদ ধরলেন কি ভাবে জানেন? হঠাৎ শরীর বড় ক্লান্ত হতে লাগল; weakness, অত্যন্ত টায়ার্ড। বিজ্ঞাপনের হরলিক্‌সে প্রতিকার হল না। তখন ওর সঙ্গে এক চামচ ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ডাক্তার বললেন, মিঃ মুখার্জ্জি, বয়স তো পঞ্চান্ন হল; এখন ইয়ং ম্যানের এনার্জি পেতে হলে আপনাকে সোমরস পান করতে হবে। বুঝেছেন? যখন টায়ার্ড ফীল করবেন তখন এক চামচ দু চামচ ব্র্যাণ্ডি খান। এ ছাড়া আমি বলি কি, আপনি রাত্রে ডিনারের সময় একটি পেগ পান করে নেবেন।

উনি বলেছিলেন, ভেবে দেখি।

আমি বলেছিলাম, এর আর ভেবে দেখবে কি? এ তো ওষুধ।

ডাক্তার বলেছিলেন, এক্‌স্যাক্‌টলি।

এর পর এক পেগ থেকে দু পেগ, দু পেগ থেকে তিন পেগ; তারপর ডিনার টেবিলে পুরো বোতল রেখে বিলিতী মতে ডিনার; খাবার আসত গ্রেট ইস্টার্ণ, গ্র্যাণ্ড থেকে; যুদ্ধ বিভাগের সাহেব থাকতেন অতিথি। প্রথম প্রথম হোস্টেসের কাজ করে দিত লনা; তারপর করতাম আমি। এই করতে করতে একটু একটু করে পিছলে পিছলেই বলুন, আর ভাসতে-ভাসতেই বলুন একেবারে এইখানে, এই বর্তমান কলঙ্ক-সমুদ্রে এসে পড়লাম, যেখানে জীবন-সমুদ্রে স্রোত আছে অথচ খুব তরঙ্গ নেই, যেখানে বরফ-জমা হিম শীতলতা নেই, উত্তাপও নেই। এবং আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা হল একালের কালোচিত একটা প্রগ্রেসিভনেস, সমৃদ্ধ বড় বড় বন্দরের একটা সমাবেশ আছে তটে-তটে; ইমোশ্যন-সর্বস্ব জীবনের দিগন্ত বড় অনুর্বর। নির্জন, বড় উদাসীন, বড় নির্বাক। আমাদের, বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে, সেইটেই তো অভিযোগ ঠাকুরজামাই। সেকালে যারা আপনার দাদার খদ্দরের জামা-কাপড় পছন্দ করে নি, তারাই তাঁর স্যুট পরা দেখে ক্ষেপে উঠল। যারা আমার শিথিল কবরী পছন্দ করতে পারে নি, তারা আমার চুল কেটে ফেলাকে চরম সর্বনাশ মনে করে গাল দিতে লাগল।

যারা আপনার দাদার স্যুট-পরা চেহারা আর আমার ববছাঁটা-চুল চেহারা পছন্দ করে না তারা কি খুব প্রগ্রেসিভ নন্দাই?

হেসে ফেললেন মণি-বউদি।

তারপর বললেন, নেহাৎ পুরনো কালের এস্টাব্‌লিশ্‌ড্‌ সাহিত্যিক বলে কাপড়-জামাতে পার পেয়ে গেলেন, নইলে স্যুট কিম্বা হাওয়াই সার্ট আর প্যাণ্ট পরতেই হত। না হলে প্রগ্রেসিভ হতেন না।

আমি সেইবারই চায়না থেকে ফিরে এসেছি।

বললাম, না বউদি, আমিও এবার প্রগেসিভ বলে প্রমাণ দিয়ে এসেছি। কোটপ্যাণ্ট, —অবশ্য গলাবন্ধ প্রিন্সকোট—পরে চায়না গিছলাম। এবং ডিনার টেবিলে ওদের সেই অতি প্রাচীন মদ্যও পান করে এসেছি। বউদির শেষকালের কথাগুলি ভারী ভাল লাগছিল। কথাগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাতে উত্তাপ ছিল না। অবজ্ঞা ঘৃণাও ছিল না। ওই ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেও কোন আক্ষেপও ছিল না। একটা দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে এল সূর্যাস্তের সঙ্গে গেল, তার মধ্যে রৌদ্র হল, মেঘ এল, হয়তো বৃষ্টি হল কিম্বা হল না; ফুল ফুটল, সারাদিন একটু একটু করে শুকালো, তারপর ঝরে পড়ে গেল। সূর্যাস্ত হল পাখীরা কলরব করল। শেষ হয়ে গেল। জগতের ইতিহাসে এই একটি দিন, এর সঙ্গে অন্য কোন দিনের মিল নেই, আবার সকল দিনের সঙ্গে এক ও অভিন্ন।

অমোঘ নিয়মে এমনি হয়। তেমনিই হয়েছে বা ঘটেছে তাঁর বেলায়।

আমি অন্তত এই বুঝেছিলাম। তিনিও যেন তাই বলতেই চাচ্ছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, দেখুন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে আমার জীবনে যা ঘটেছে তা আমরা ঘটাইনি, তা আপনি ঘটে গিয়েছে, আমাদের বাধা ও সচেতন চেষ্টা সত্ত্বেও। এ নিয়ে আমরা সুখ-দুঃখ দুই-ই ভোগ করেছি। ফলও খেয়েছি, কাঁটাতে সর্বাঙ্গ ছড়েও গেছে। সাধারণ অবস্থায় দেশে থাকলে হয়তো অনুতাপ দুঃখ অনুভব করতাম বাধ্য হয়ে; সকলে মিলে বাধ্য করত দুঃখ অনুতাপ বোধ করাতে। কিন্তু তার নাগালের বাইরে ছিলাম তখন। এই এতকালই ছিলাম। এ নিয়ে অনুতাপ আমার নেই। তাই ওই জবাব দাখিল করে লড়ব বলে কোমর বেঁধেছিলাম। এবং আমার জিতবার চান্সই বেশী। ওরাও ঘায়েল হয়ে পড়েছে। তবু আর ভাল লাগছে না। ওদের সব দিয়ে দিচ্ছি মানে একটা ট্রাস্ট করে তার ট্রাস্টি করে দিয়েছি, আর ওদের দিক থেকে শর্ত নিয়েছি যে, আমার অন্তে ওরা আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে শ্রাদ্ধ করবে। খরচের পরিমাণ দেওয়া আছে। ওঁর নামে একটা বৃত্তি দেবার কথা আছে। বাকীটা ওরা খাবে। একটা বাড়ী-ভাড়ার আয় শুধু নিজের জন্যে রেখেছি, তা থেকে তিনশো টাকা আসবে। তার থেকেই আমার চলে যাবে। সেটা আমি ওই লছমনপ্রসাদকে দিয়ে যাব। ওই লোকটা ছেলে বয়স থেকে এ পর্যন্ত বরাবর আমাকে দিদিজী বলেছে এবং তার মর্যাদা ষোল আনা রেখে এসেছে।

চুপ করলেন মণিবউদি।

আমি নির্বাক হয়ে বসে শুনছিলাম, নির্বাক হয়েই বসে রইলাম। অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে যেন মৌচাক ভাঙার পর উড়ন্ত মৌমাছির মত ঝাঁক-বন্দী হয়ে এদিকে-ওদিকে-সেদিকে মনের আকাশ ছেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল; আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ওই নারীটি। কিন্তু মণি-বউদির উপর আমি তাদের লেলিয়ে দিতে পারি নি। সেটা আমার দুর্বলতা যদি বা হয়, হতেও পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, মণি-বউদি তাতে ভীত ছিলেন না; আক্রমণ করলে তা সহ্যও তিনি করতে পারতেন হাসিমুখে।

বউদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আপত্তি হবে না তো নন্দাই?

ওই নন্দাই সম্বোধনে সঙ্কল্পচ্যুত হলাম। আর থাকতে পারলাম না, অত্যন্ত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত বেঁকিয়ে প্রশ্নটা করে বসলাম উত্তরের ছলে, বললাম নন্দাই বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার ননদকে ননদ বলে স্বীকার করে লাভ তো শুধু কটু কথা শোনা।

বউদি বললেন, ওটা আমি অস্বীকার কিছুতেই করতে পারব না ভাই ঠাকুরজামাই। আই লাভ্‌ড্‌ হিম, আই ওয়ান হিম ; আমি ভালবাসার যুদ্ধে মাসীকে হারিয়ে জিতে নিয়েছিলাম। হি ওয়াজ মাই ওন।

হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, আপনি পুরাণের খুব ভক্ত। পুরাণের কথাই বলি, কৃষ্ণ কার ? রাধার না রুক্মিণীর। রাধাও বলে আমার। রুক্মিণীও বলে আমার। আমি রাধাই হই, আর রুক্মিণীই হই—তিনি আমার। তাঁর উত্তরাধিকারিণী আমি।

এখানেই শেষ নয়।

আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল কাশীতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর। দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে গঙ্গাস্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ১৯৬২ সাল, শীতকাল।

এক নজরে চেনার উপায় ছিল না। কারণ তখন তাঁর এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, একই ত্রিভুজকে দুই ভিন্ন স্থানে এঁকে বা রেখে কোনমতেই দুটিকে এক করে মেলানো গেল না।

এ এক উদাসিনী।

চুলগুলি রুখু, এবার তৈলাভাবে রুখু, এবং ববছাঁটা চুলগুলি বড় হয়ে পিঠ পর্যন্ত ঢেকে ছড়িয়ে আছে, বাতাসে দুলছে।

চোখে যেন ছুরির ধার।

সারা সর্বাঙ্গে যেন একটা আশ্চর্য জর্জর ভাব। যার উত্তাপ কেউ কাছে দাঁড়ালেই অনুভব করতে পারে। তিনি বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলেন, কি ? কি চাই ? সরে যান দু পা এবং নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত করবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান।

আমি হরিশচন্দ্রের ঘাটে একখানা নৌকা ভাড়া করে শীতের অপরাহ্ণে শান্ত গঙ্গা বেয়ে চলেছিলাম মণিকর্ণিকার দিকে। হঠাৎ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এসে মনে হল ঠাণ্ডা যেন বড্ড ঘন হয়ে উঠেছে। নৌকা দশাশ্বমেধেই ভিড়িয়ে দিতে বললাম। ঘাটের কাছে এসেই চোখে পড়ল মণিবউদিকে। এবার সেই পুরানো ঢঙে ঝলমলে ছাঁদে ফিতে-পাড় শাড়ী পরে কাঁধে একটা ঝোলা ঝুলিয়ে উনি গঙ্গার বুকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এরই মধ্যে কি করে যে চিনে ফেললাম, ইনিই মণি-বউদি, তা বলতে পারিনে।

ঘাটে নেমে এক পা এক পা করে এগিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ঘাটের মাথায় সেই উঁচুতে এসে সামনে দাঁড়ালাম।

উনি চমকে উঠলেন।

নিষ্পলক চোখের স্থির দৃষ্টিতেও তারা চকিতে চমকে উঠল, ঠিক সেই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দূরদিগন্তে খেলে যাওয়া বিদ্যুৎচমকের আভাসের মত। কপালে কুঞ্চন রেখা জেগে উঠছিল।

আমি বললাম, আপনি তো মণি-বউদি!

কপালে কুঞ্চনের রূঢ়তা শিথিল হয়ে গেল! ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। মিলিয়ে গেল ক্রমে।

আমি বললাম, আমি আপনার নন্দাই।

হাসলেন মণি-বউদি।

আশ্চর্যভাবে এতদিন পর সেই দেখনহাসি মেয়েটিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। ভেবে পেলাম না, কোথায় সে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল।

কথা তাঁর সঙ্গে অনেক হয়েছিল। সব কথাই পুরনো কথা। নতুন কথার মধ্যে বললেন, ঠাকুরজামাই আর বলব না আপনাকে, তার থেকে দাদা বলব।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মানে?

—মানে? মানে সব গোলমাল হয়ে গেছে দাদা। সব গোলমাল হয়ে গেছে। আজ ভেবে পাচ্ছি না, যাকে পেয়েছিলাম, তাকে চেয়েছিলাম কিনা। এত যে লড়াই করেছিলাম মাসীর সঙ্গে, সে কি ওই মানুষটাকে মাসী চেয়েছিল বলে ওকে কেড়ে নেবার ছুতো করে লড়াই বাধিয়েছিলাম? তাকে যদি না চেয়েছিলাম তো চেয়েছিলাম কাকে?

দাদা—ভিড় করে আসে মানুষের মিছিল।

অকপটে এই গঙ্গার ঘাটে বসে স্বীকার করছি—কাকে চেয়েছিলাম, এই প্রশ্ন যখন নিজেকে নিজে করি, তখন কত মুখ যে ভেসে ওঠে তার আর হিসেব-কিতেব নেই। তার মধ্যে পথিক আছে, ভিক্ষুক আছে, রাজা আছে—

থাক দাদা ওসব কথা। যাকে চাই তাকে পাই না, তাকে জানি না, তাকে চিনি না। যাকে পাই, যে আসে কাছে তাকে চাই না, যদি-বা দায়ে পড়ে তার হাত ধরি তো তার পর থেকেই পালাবার পথ খুঁজি।

নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেহটা যেন নতুন করে নিয়মকানুন করে নবীন হয়ে উঠল। শরীরে ভাল আছি।

কথাটা মিথ্যে নয়।

হেসে বললেন, নিজেকে বিশ্বাস করি নে। মরণের পথ তাকিয়ে আছি। বড় কৃচ্ছ্রসাধন করে কঠিন করে বেঁধে রেখেছি।

* * *

সেই মণি-বউদি মারা গেছেন।

চিঠি এসেছে।

শ্রাদ্ধ করেছে, দলিলের শর্তানুযায়ী অমৃতবাবুর উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমি জানি স্বর্গ থাকলে

মণিমালা পিণ্ডের অপেক্ষা না করেই স্বর্গে গিয়েছে।

আমি নিজের মনে-মনে স্মরণীয় পঞ্চকন্যার নামের সঙ্গে মণিমালার নাম ষষ্ঠ নাম হিসেবে জুড়ে দিয়ে তাঁর তর্পণ করলাম। দু-ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল। মণি-বউদি আমার আদরিণী গরবিনী—তিনি স্মরণীয়া, তিনি বরণীয়া। অন্ততঃ আমার কাছে তিনি স্ফটিকে গড়া নারীমূর্তি, তাঁর গায়ে কালি কাদা কলঙ্ক কোন কিছুর ছিটে লাগে না, দাগ ধরে না। অমলিনা আমার মণি-বউদি।

মধ্যে মধ্যে আর একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারছে।

মণি-বউদি কি আমার ভারতবর্ষ?

কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেবস্থান সাধু দৈবজ্ঞ খুঁজেছেন, আবার লিপস্টিকরুজ মেখে আধুনিকা সেজে পার্টি আলো করে বসেছেন। তারপর স্বাধীনা হয়ে সমস্ত অতীত সংস্কারকে বর্জন করে বিদেশের অভ্যর্থনার আসরে সর্বসংস্কারহীনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন? কিন্তু—? শেষটা যে মেলে না।